রাজকুমারী

চিরঞ্জীব সেন

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ

শুভ ১লা বৈশাখ ১৩৬১ সন

প্রকাশক

শ্রীসুনীল মণ্ডল

৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট

শ্রীগণেশ বসু

হাওড়া-৪

ব্লক

মডার্ন প্রসেস

কলেজ রো

কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ

ইম্প্রেসন্ হাউস

৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট

কলকাতা-৯

মুদ্রক

সোমা প্রিণ্টার্স

৩৬ এন রোড

হাওড়া-৮।

রাজকুমারী

কর্তা দাদুর বয়েস নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই। যে বছরে কলকাতা থেকে ইণ্ডিয়ার ক্যাপিটাল আবার দিল্লিতে চলে গেল, সেই বছরে আমার জন্ম, একথা তিনি প্রায়ই বলেন। এই বয়সেও শরীর বেশ মজবুত আছে, হাঁটতে পারেন লাঠি ছাড়াই, কাটোয়ার ডাঁটা চিবিয়ে খেতে পারেন। শুধু চোখ দুটো গেছে। মাস ছয়েক আগেও একটা চোখ দিয়ে বেশ কাজ চলছিল, এখন সেটাও ঝাপসা হয়ে গেছে। খন্তা আর খুন্তির মুখও ভালো করে দেখতে পান না। ঐ দু'জন তাঁর মেজো নাতির ছেলেমেয়ে, অর্থাৎ পুতি।

ঈশান হালদারকে এক সময় লম্বা তালগাছের সঙ্গে তুলনা করা হতো, এখন মেরুদণ্ড বেঁকে গেছে খানিকটা, থিয়েটারের রাজা-বাদশাদের মতন একটা হাত মুঠো পাকিয়ে পিঠের ওপর রেখে হাঁটেন। সামনা-সামনি কেউ পড়ে গেলে চেনার জন্য একদৃষ্টিতে তাকান। সবাই এড়িয়েই চলতে চায়, কেন না চিনতে পারলেই তিনি অনর্গল কথা বলতে শুরু করবেন। বুড়ো মানুষরা তো সংসারের আর কোনো কাজে-কর্মে লাগে না, তাই তাদের মুখ চলে অনবরত। সব পুরোনো কালের গল্প। তা এই আশি বছরেরও বেশি লম্বা জীবনে গল্পও তো অনেক থাকবেই।

কেউ হয়তো একটা শোল মাছ ধরেছে খাল থেকে, সেটা হাতে ঝুলিয়ে

বাড়ি ফিরছে, ঈশান হালদার তার পথ আটকালেন। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করেন, ও কে, নিরঞ্জন নাকি?

লোকটি বললো, আইজ্ঞা না, আমি কেষ্টধন।

ঈশান হালদার তাকে আপাদমস্তক লক্ষ্য করে বললেন, মাছ পেলে নাকি? ভালো, ভালো। একটু আমিষের গন্ধ না হলে বাড়িতে আধি-ব্যাধির নজর পড়ে। তা এখন ইলিশের দর কত বলতে পারো?

কেষ্টধন একেবারে আকাশ থেকে পড়ে। ইলিশ? ইলিশ তো খায় শহরের মানুষ। এদিকে বড় নদী-গাঙও নেই যে জেলেদের জালে দু'একটা উঠবে। তিন বছর আগে এক মামলার জন্য রানাঘাটে গিয়ে কেষ্টধন শেষ ইলিশ দেখেছে।

সে হেসে বললো, ও কত্তাদাদা, ইলিশ কোথা দেখলেন, এটা একটা চারা শোল?

—তা বুঝেছি! তোকে জিজ্ঞেস করলুম, ইলিশের দাম এখন কত চলছে?

—কে জানে! পঁচিশ-পঞ্চাশ হবে!

—বাপরে! শুনলেও পিলে চমকে ওঠে। আমি কততে ইলিশ কিনেছি জানিস! তুই তখন জন্মাসনি। একবার চর মুগুরিয়ার হাটে গেছি আমার দাদার সাথে, গিয়ে দেখি কী, নদীর ধারে একেবারে চাঁদের হাট। সব কটা নৌকা ভর্তি শুধু ফালি ফালি চাঁদ। অত ইলিশ তুই বাপের জন্মে দেখিস নাই। দুই আনা করে জোড়া চেয়েছিল, দরদাম করে পাঁচ পয়সায় দিয়ে দিল একজোড়া। ওজন টোজন তো তখন ছিল না। এক একখান ইলিশ ধর দুই দ্যাড়-দুই সের!

—ওসব পুরোনো কথা ছাড়েন! তখন ছিল রামরাজত্ব!

—শোন না, রামজয়দা ছিল আমাদের গাঁয়ের মস্ত খাওইয়ে। সাঁইত্রিশ পিস ইলিশ ভাজা খেয়েছিল, আমি নিজের চোখে দেখেছি, নিজে শুনিছি। আমার কাকা, নিজের কাকা নয় অবশ্য, বাবার বৈমাত্র ভাই, তিনি একবার ঐ রামজয়দাদারে চ্যালেঞ্জ দিলেন। জমিদার সীতু চৌধুরীর বাড়িতে···

কেষ্টধন আর দাড়ায়নি, ঈশান হালদার বেশ কিছুক্ষণ পরে বুঝতে পারেন যে তাঁর কোনো শ্রোতা নেই।

ছোট চাষী আর ভূমিহীন কৃষকদের গ্রাম। এর মধ্যে ঈশান হালদার একজন বেমানান মানুষ। প্রায়ই তিনি আফশোষ করে বলেন, ছিলাম ভদ্দরলোকের বংশ, হয়ে গেলাম ছোটলোক।

দেশ বিভাগের আগে ওদিকের বাংলার ঈশান হালদার প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার ছিলেন। সেকালের এফ এ পাশ। ইংরেজিতে বেশ সড়গড়। কিন্তু সে সব বিশেষ কাজে লাগলো না। ব্যাডক্লিফের রোয়েদাদে ওলট পালট হয়ে গেল সব কিছু, বাড়ি ঘর ছেড়ে, সব কিছু ফেলে এসে যখন আশ্রয় নিয়েছিলেন ফুলিয়া ক্যাম্পে, তখন তিনি অর্ধ উন্মাদ। তাঁর জোয়ান ছেলেটি দাঙ্গায় কাটা পড়েছিল, চোখের সামনে সেই দৃশ্য দেখে তিনি আর মাথা ঠিক রাখতে পারেন নি। পাগল হয়ে গিয়ে এক হিসেবে ভালোই হয়েছিল, মাঝখানের আট-দশটা বছরের চরম দুঃখ-কষ্টের সময়টা তিনি কিছু উপলব্ধি করতে পারেননি। কী করে যে তাঁদের পরিবারটা কোনোক্রমে বেঁচে গেল, তা তিনি ঠিক জানেন না। যখন তাঁর বোধ খানিকটা ফিরে এল, তখন তাঁর নাতি-নাতনীরা কেউ লেখা পড়া শেখেনি, ব্রাহ্মণত্বের কোনো চিহ্নই নেই কারুর মধ্যে, আর পাঁচটা দীন-দুঃখী পরিবারের মতন তাঁদের পরিবারেরও শুধু খাওয়া পরার চিন্তাতেই দিন কেটে যায়। দুই নাতির মধ্যে একজন এখন রীতিমত চাষী, আর একজন অন্য গ্রামে উঠে গিয়ে এক মুদিখানায় কাজ নিয়েছে।

এ গ্রামে কথাবার্তা বলার একটাও যোগ্য লোক খুঁজে পান না ঈশান হালদার। তাঁর মুখে ইংরিজি শুনলে সবাই হাসে। তিনি পুরোনো কালের গল্প শুরু করলে অমনি শ্রোতারা বলে ও কত্তাদাদু, ওসব পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে আর কী হবে? আজ চাল ফুরোলে কালকের দিনটা কী করে চলবে সেই কথা ভাবেন।

বাস্তুভিটে ত্যাগ করে তাড়া খাওয়া জন্তুর মতন যখন ঈশান হালদার

সপরিবারে এদিক সেদিক পালাতে পালাতে এদিককার এক জমিদারের পরিত্যক্ত বাগানবাড়িতে এসে উঠেছিলেন, পঙ্গপালের মতো উদ্বাস্তুর দল যখন জায়গা পাওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যেই ঠেলাঠেলি করছে, মাথাটা যখন তাঁর সত্যি ঘুলিয়ে উঠতে শুরু করেছে, সেই সময় তিনি নিজেদের দুঃখ দুর্দশা ও প্রতিকারের প্রার্থনা জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন কয়েকখানা। মহাত্মা গান্ধী, জিন্না, ষষ্ঠ জর্জ, নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল আর শরৎ বোসকে। দগদগে ঘা আর রক্ত মাখা দুটি নতুন দেশ নিয়ে দু'দেশের নেতারা তখন হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা উত্তর দেবার সময় পান নি। কিন্তু ব্রিটিশ সম্রাট প্রাক্তন প্রজার চিঠির উত্তর পাঠিয়েছিলেন। রাজা-বাদশারা নিজের হাতে চিঠি লেখেন না, এক কর্মচারী সুদৃশ্য কাগজে টাইপ করা চিঠিতে জানিয়েছিল যে ষষ্ঠ জর্জ ঈশানচন্দ্র হালদারের চিঠির বক্তব্য জেনেছেন এবং তাঁর গভীর সহানুভূতি জানিয়েছেন। তিনি আশা করেছেন, একদিন সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। খামসমেত সেই চিঠি এখনো ঈশান হালদারের কাছে সযত্নে রাখা আছে। এ গ্রামে কাকেই বা সে চিঠি দেখাবেন।

সেই যে জমিদারের বাগানবাড়ি, ঈশান হালদাররা একদা যেটি জবর দখল করেছিলেন, পরে সেখান থেকে উৎখাত হয়ে তিন কাঠা করে জমি পেয়েছেন, সেই বাগানবাড়িটি বিক্রি হয়ে গেছে, এখন সেখানে একটি হাসপাতাল হয়েছে। সরকারি হাসপাতাল নয়, কয়েকজন ভালো মানুষের ছেলে একটি সঙ্ঘ বানিয়ে গ্রাম সেবা করেন। তাঁরা ঐ হাসপাতাল খুলে শিশুদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। সুন্দর সুন্দর চেহারার শহরের নারী পুরুষরা সেখানে খাটেন দিন রাত, জল কাদার রাস্তা ভেঙে গ্রামের বাড়ি বাড়ি যান বাচ্চাদের ক্রিমির ওষুধ খাওয়াতে। সব বিনা পয়সায়।

নাতির ছেলে খন্তার বয়েস মাত্র চার বছর, তার পেটটা দিন দিন ফুলে একটা কুমড়োর মতন হয়ে উঠছিল, তাকে নিয়ে ঈশান হালদার একদিন গেলেন সেই হাসপাতালে।

একজন ছিপছিপে চেহারার তরুণ ডাক্তার কত যত্ন করে দেখলেন খন্তাকে। ওষুধ দেবার আগে খন্তার গাল টিপে আদর করে লজেঞ্চুশ দিলেন দুটো। ঈশান হালদার তখনও এক চোখে খানিকটা দেখতে পান, ডাক্তারেব ব্যবহাব দেখে তিনি অভিভূত। গরিব মানুষেরও তা হলে বন্ধু আছে? তারা দূর থেকে আসে।

ঈশান হালদার ডাক্তারকে সম্বোধন করে আবেগকম্পিত গলায় বলে উঠলেন, রেসপেকটেড স্যার, মে আই হাম্বলি প্রে টু ইউ স্যাব টু কাইণ্ডলি এগজামিন দিস ওল্ড ম্যান। আই অ্যাম সাফারিং ফ্রম ··

ডাক্তাবটি এমনই চমকে উঠলেন যে তাঁব হাত থেকে কমল খসে পড়লো। তিনি বিস্ফারিত চোখে তাকালেন। শুধু একটা ময়লা ঠেঙো ধুতি পরা, বুক ভর্তি সাদা লোম, মাথাব সব চুল আর ভুরুও সাদা, গাল তুবসে গেছে, এমন এক বৃদ্ধেব মুখে এরকম বোম্বাস্টিক ইংরিজি।

ঈশান হালদাব আব এক প্রস্ত সাজানো বাক্য শুরু করতেই ডাক্তাব জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে আপনাব?

ঈশান হালদার বললেন, মাই আই সাইট, স্যাব, ডে বাই ডে ইজ গেটিং ডিমাব অ্যাণ্ড ডিমাব

ডাক্তাব বললেন, কিন্তু আমবা যে এখানে শুধু বাচ্চাদেব চিকিৎসা করি।

ঈশান হালদাব বললেন, ইউ আর এ মেডিক্যাল প্রাকটিশানাব, স্যার, ভেরি নোবেল প্রফেশান। চিকিৎসকদেব নিকটে তো সকল রোগীই সমান!

ডাক্তাবটিব নাম প্রীতম সবকার। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমাদের উপায় নেই যে! গ্রামে তো সব লোকই পেশেণ্ট। কিন্তু আমাদেব শুধু ম্যাল নিউট্রিশানে ভুগছে যে সব শিশু···

এতেও হতাশ বা নিরুদ্যম হলেন না ঈশানচন্দ্র। পরদিন একাই টুক টুক করে পাঁচ মাইল রাস্তা হেঁটে আবাব হাজির হলেন হাসপাতালে। একটু সুযোগ পেতেই সে ছোকরা ডাক্তারটির সামনে বসে পড়ে বললেন, দিস হামব্‌ল সেল্‌ফ প্রেজ ,ইয়োব কাইণ্ড অ্যাটেনশান স্যাব···

একটা খাঁকি ঠোঙার ভেতর থেকে বার করলেন চৌকো বিবর্ণ খামটি, তার ওপরে ব্রিটিশ কোট অফ আর্মস ছাপা।

ডঃ প্রীতম সরকার জিজ্ঞেস করলেন এটা কী? পুরোনো প্রেসক্রিপশান?

—না, স্যার। হিজ ম্যাজেস্টি দি ব্রিটিশ এমপারারের চিঠি। বড়লাট নয় স্যার, স্বয়ং এমপারার। আমাকে চিঠি দিয়েছেন।

দারুণ কৌতূহল নিয়ে ডঃ প্রীতম সরকার খামটি খুললেন। চিঠিটি পড়তে পড়তে তার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠলো। মুখ তুলে, একটু দূরে অন্য টেবিলে বসা একটি তরুণীকে ডেকে বললেন, মালবিকা, এদিকে দেখে যাও! চট করে এসো—

মালবিকা একটি বাচ্চার ব্লাড নিচ্ছিল, সে কাজ শেষ করে উঠে আসতে খানিকটা দেরি হলো। ততক্ষণে ঈশানচন্দ্র তাঁর সামনের ডাক্তারের সঙ্গে লম্বা গল্প জুড়ে দিয়েছেন।

মালবিকা আসার পর তার হাতে চিঠিটা তুলে দিয়ে প্রীতম সরকার বললেন, এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে যে-সে লোক ভেবো না, জর্জ দা সিকস্থ এঁকে চিঠি লিখেছিলেন।

ঈশানচন্দ্র বললেন, ইউ আর লার্নেড পার্সনস। ইউ উইল আণ্ডারস্ট্যাণ্ড···

মালবিকা চিঠিটা পড়ে বেশ মজা পেল। চিঠির তারিখ তার জন্মের আগের। মাথার পেছনে একটা আঙুল ঘুরিয়ে সে তার চোখে প্রশ্ন আঁকলো।

হাসি চেপে ডঃ প্রীতম সরকার বললেন, ইনি চাইছেন, আমরা এঁরও চিকিৎসা করি। এ রকম একজন বিশিষ্ট নাগরিককে আমরা ফিরিয়ে দিই-ই বা কী করে? তুমি এঁর চোখটা একটু দেখে দাও···না!

মালবিকা ঈশানচন্দ্রের একটা চোখ চওড়া করে খুলে সেদিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি ব্রিটিশ রাজাকে চিঠি লিখেছিলেন কেন?

ঈশানচন্দ্র বললেন, টিল দি ইয়ার নাইন্টিন হানড্রেড অ্যাণ্ড ফরটি সেভেন এ ডি. উই ওয়্যার ব্রিটিশ সাবজেক্টস! প্রজা বিপদে পড়লে রাজার একটা দায়িত্ব আছে।

ডঃ প্রীতম সরকার বললো, কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর তো উনি আর

আমাদের রাজা ছিলেন না।

—আমি জিন্না আর জওহরলালকেও পত্র দিয়েছিলাম।

—উত্তর পান নি নিশ্চয়ই।

মালবিকা বললেন, দাদু, এই চোখ দিয়ে তো অনেক কিছু দেখেছেন, আর এখন দেখার কী বাকি আছে! সব যন্ত্রই তো এক সময় পুরোনো হয়ে যায় ·

ঈশানচন্দ্র কাতরভাবে বললেন, না, না মা, ও কথা বলে আমায় বিদায় করে দিও না। আমাদের পূর্বতন গ্রামের পুরোহিত শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য একশত এক বৎসর বেঁচেছিলেন, সজ্ঞানে, শেষ দিন পর্যন্ত শাস্ত্র পাঠ করেছেন। আমি আমার নাতিদের মুখ দেখতে পাই না। ওরা লেখাপড়া শেখে না, ছোটলোক হয়ে যাচ্ছে, আমি ওদের পড়াবো ··

মালবিকা বললো, ছানি কাটালে, কিছু উপকার হতে পারে, কিন্তু এই বয়েসে আবার কাটাকাটি করাবেন। সে ব্যবস্থাও তো এখানে নেই।

ডঃ প্রীতম সরকার বললেন, আচ্ছা, আপনার জন্য আমি কলকাতা থেকে ওষুধ এনে দেবো।

এই দুই তরুণ তরুণী ডাক্তারের সঙ্গে ঈশানচন্দ্রের বেশ ভাব হয়ে গেল। মাঝে মাঝেই গ্রাম থেকে হাঁটতে হাঁটতে এসে এই হাসপাতালে বসে থাকেন। এরা শিক্ষিত লোক, তাঁর কথাবার্তার মর্ম বোঝে। অনেক সময় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পুরোনো দিনের কথা জিজ্ঞেস করেন। ডঃ প্রীতম সরকার কিছু আই লোশান কিনে এনে দিয়েছেন। ঈশানচন্দ্রের ধারণা ওতেই তিনি আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন।

ডঃ প্রীতম সরকার জিজ্ঞেস করেন, দাদু, মনে করুন, আপনার দুটো চোখই ভালো হয়ে গেল। তারপর আপনি কী কী দেখতে চান বলুন তো।

ঈশানচন্দ্র সহসা উত্তর দিতে পারলেন না। সারা জীবনটার দিকে ফিরে তাকাতে গেলে সব কিছুই যেন গুলিয়ে যায়।

মালবিকা তাঁকে চা খাওয়ায়। হাসপাতালে আসার এটাও একটা বড় আকর্ষণ ঈশানচন্দ্রের। বাড়িতে তো শুধু ডাল-ভাত ছাড়া আর কিছুই

জোটে না। হাসপাতালের চায়ে বড় ভালো স্বাদ । উনি চায়ে প্রথম চুমুক দিয়েই বলেন আর হু'চামচ চিনি দাও তো মা লক্ষ্মী! তোমার কল্যাণ হোক। স্বামী-পুত্র নিয়ে চিরশান্তি লাভ করো মা!

মালবিকা হা হা করে হেসে ওঠে।

ডঃ প্রীতম সরকার বললেন, চিরশান্তি কথাটা বহুদিন পরে শুনলুম।

মাস দেড়েক পর ডঃ প্রীতম সরকার একদিন ঈশানচন্দ্রকে দেখামাত্র বললেন, দাহু, মস্ত বড় খবর আছে! রাজকুমারী আসছেন, জানেন তো? আপনি দেখা করবেন না?

ঈশানচন্দ্র কিছুই বুঝতে পারেন না। রাজকুমারী? কোন্ রাজকুমারী? তিনি এ খবরটুকু ভালোই জানেন যে এদেশে এখন আর রাজা নেই। ইন্দিরা গান্ধী আছেন বটে, কিন্তু তাঁর তো কোনো মেয়ে নেই।

মালবিকা তার টুসটুসে ঠোঁটে মধুর ভঙ্গি করে বললো, প্রিন্সেস অ্যান আসছেন আমাদের এই হাসপাতালে। উনি বোধহয় খবর পেয়ে গেছেন যে আপনি থাকেন এর কাছাকাছি। আপনি তো ওঁর দাহুর বন্ধু ছিলেন।

ঈশানচন্দ্র আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, প্রিন্সেস অ্যান কে?

ডঃ প্রীতম সরকার বললেন, প্রিন্সেস অ্যান হলেন রানী এলিজাবেথের মেয়ে। তার মানে জর্জ দা সিক্স্থ-এর নাতনী! আপনার কাছে তো ওব দাহুর চিঠি আছে! আপনি দেখাবেন সেই চিঠি!

ঈশানচন্দ্র বিহ্বল বোধ করতে লাগলেন। ইংলণ্ডের রানী—তাঁর মেয়ে রাজকুমারী· ·আসবেন এত দূরের গ্রামে? কেন? এদিককার একহাঁটু কাদা, মটোর গাড়ি চলবে না, রাজকুমারী কি তা হলে আসবেন গরুর গাড়িতে?

ঈশানচন্দ্রের বুক কাঁপতে থাকে। তবে কি রাজকুমারী আসছেন সেই চিঠির জন্যই? রাজবাড়ির দফতরে নিশ্চয়ই সব চিঠির কপি জমা থাকে। চিঠির বয়ান ঈশানচন্দ্রের মুখস্ত। সম্রাট লিখেছিলেন, আশা করি ভবিষ্যতে সব ঠিক হয়ে যাবে। রাজকুমারী কি মিলিয়ে দেখতে আসবেন, সব ঠিক হয়ে গেছে কি না? বনেদী বাড়ির ধাবাই আলাদা। ওরা কিছুই

ভোলে না।

ঈষৎ অবিশ্বাসের সঙ্গে ঈশানচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি আসবেন রাজকুমারী?

ডঃ প্রীতম সরকার বললেন, হ্যাঁ, আমাদের কাছে চিঠি এসেছে, সব সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে হবে।

মালবিকা বললো, আপনি রাজকুমারীর সঙ্গে ইংলিশে কথা বলবেন। দাদু, সেদিন একটা জামা পরে আসতে হবে কিন্তু। জামা আছে তো আপনার?

ঈশানচন্দ্র ঘাড় নাড়েন। গরমকালে দরকার হয় না, শীতকালে গায়ে দেবার জন্য তাঁর একটা ফতুয়া আছে, সেটা পরে এলেই হবে। পিঠের দিকে একটু ছিঁড়ে গেছে, সেলাই করে নিতে হবে।

কয়েকদিনের মধ্যেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে ডাক্তাররা তাঁর সঙ্গে মিছে রসিকতা করেন নি। শহর থেকে ট্রাক ভর্তি ভর্তি ইট আর শুর্কি আসতে শুরু করে। একটা মস্ত বড় লোহার গাড়িও নাকি এসেছে। খন্তা আর খুন্তি তাদের কর্তা দাদুর এই সব খবর শোনায়। তিনি কুলি-কামিনদের ব্যস্ততার শব্দ শুনতে পান। রাস্তা পাকা হচ্ছে, রাজকুমারীর গাড়ি আসবার জন্য। গ্রামের লোকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের রোজ নিয়ে যাচ্ছে হাসপাতালে, এখন নাকি তাদের ওষুধ ছাড়াও নতুন জামা দেওয়া হচ্ছে।

ডঃ প্রীতম সরকার আর মালবিকা এখন ঈশানচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলার বেশি সময় পান না, হাসপাতালটা পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে তকতকে করে তুলতেই তাঁরা ব্যস্ত। ঈশানচন্দ্র ভাবেন, তা তো হবেই, রাজকুমারী এসে বসবেন, কাছাকাছি আর তো কোনো পাকাবাড়ি নেই।

এরই মাঝে মালবিকা একদিন ঈশানচন্দ্রকে একটা নতুন ধুতি দিয়ে বললে, দাদু, আপনার কথা আমার মায়ের কাছে গল্প করেছিলুম। মা আপনার জন্য এই ধুতিটা পাঠিয়েছেন, এটা আপনাকে নিতেই হবে।

ঈশানচন্দ্রের বিবর্ণ চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে আসে। তিনি মালবিকার

হাত জড়িয়ে ধরে বলেন, তুমি আমার অন্তত একটা চোখ একটু সারিয়ে দাও মা! রাজকুমারীকে যে আমি ভালো করে দেখতে পাবো না—

মালবিকা বললো, চোখ ফাঁক করুন, আমি লোশান দিয়ে দিচ্ছি। রাজকুমারীকে কী কী বলবেন ঠিক করে রেখেছেন তো? বলা যায় না, রাজকুমারী হয়তো আপনার বাড়িতেও যেতে চাইতে পারেন।

মালবিকার এই কথায় ঈশানচন্দ্র আবার ফাঁপরে পড়েন। কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। "আশা করি একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।" সেই সব ঠিক হয়ে গেছে কি না তা মিলিয়ে দেখবার জন্য রাজকুমারী ঈশানচন্দ্রের বাড়ি দেখতে চাইতে তো পারেনই।

বাড়ি মানে তো কাঁটার বেড়া দেওয়া দু'খানি ঘর। টিনের চাল, সেই চালে কুমড়ো ফলেছে কয়েকটা। সহধর্মিনী গত হয়েছেন বহুকাল আগেই, বিধবা পুত্রবধূই সংসারটা সামলেছেন কোনো রকমে। এখন অবশ্য নাতিদেরও বিয়ে হয়েছে। কোনো ঘরে তিল ধরার জায়গা নেই, গরমকালে তাঁকে দাওয়ায় শুতে হয়। একখানা কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি পর্যন্ত নেই যে বসতে দেবেন। তাঁদের নিজেদের বাড়িতে কত কিছু ছিল, মায়ের নিজের হাতে বানানো ঝালর দেওয়া আসনই ছিল তিনখানা। সে বাড়িও বিশেষ বড় ছিল না বটে, কিন্তু একখানা বৈঠকখানা ছিল, ছোট পুকুর ছিল···।

বাড়ির মানুষদের কথাটা বলতে গিয়েও তিনি থেমে যান। এরা আর রাজকুমারীর কী কদর বুঝবে।

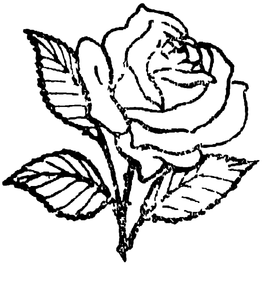
ভবিষ্যতে সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে। কই, কিছুই তো ঠিক হয়নি! আহা, রাজকুমারী দেখে দুঃখ পাবেন। না, রাজকুমারীর এখানে আসার দরকার নেই। তিনি যদি আসতে চান, ঈশানচন্দ্র বললেন, ইয়োর হাইনেস, আই বেগ টু—

আসল দিনটাতেই সকাল থেকে ঈশানচন্দ্রের ধুম জ্বর, চোখ দুটো আটা দিয়ে যেন জুড়ে গেছে, কিছুতেই খুলতে চায় না। মাঝে মাঝে শুধু উফ্ উফ্ করে বড় বড় নিশ্বাস ছাড়ছেন। বিধবা পুত্রবধূ কয়েকবার এসে কী সব কথা বলে গেল, তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। তাঁর উঠে দাঁড়াবার

ক্ষমতা নেই। তার যাওয়া হবে না। রাজকুমারী যদি শশব্যস্ত হয়ে এখানে চলে আসেন, না, না, না, সেরকম যেন না হয়, খন্তা-খুন্তিদের বলে দিতে হবে, ওরা যেন ডাক্তারবাবুদের বারণ করে দেয় । কিন্তু মুখ দিয়ে তাঁর কোনো শব্দ বেরুলো না। ঘোরের মধ্যে তিনি দেখতে লাগলেন অনেক ছবি, উঠোনের পাশে বাতাবী লেবুগাছ, একেবারে ফলে ভরে আছে, উঠোনের এক পাশে ধানের গোলা, নতুন ধান আসবে তাই দাদা সেই গোলার একটা ছাদা মেরামত করছে ষাঁড়ের গরুটা আজই বিয়োবে, বাছুরটা মাটিতে পড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে লাগলো, বড় পিসিমা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন, ওরে, মাদী মাদী। বাবা বললেন, ই ক। ্যিস বে দি. ওটা বন্না। তাঁর ছেলের বিয়ে, ঢাকায় লোক পাঠানো হ . মিঃ . নিবার জন্য, ঢিপ করে একটা শব্দ, ওরে পুকুরের জলে তাল পড়েছে রে, ছুটে যা, ছুটে যা ·

সন্ধ্যাবেলা খন্তা আর খুন্তি ছুটতে ছুটতে এসে বললো ও দাদু, তোমার রাজকুমারী আসবে না দিল্লিতে গুলি চলেছে ট্যা-রা-রা-রা ইন্দিরা গান্ধী না কে যেন মরে গেছে, রাজকুমারী সেখানে চলে গেছে।

সে কথাতেও ঈশানচন্দ্রের কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। রাজকুমারীর কথা আর তাঁর মনে নেই। ভবিষ্যতে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে, এই কথাটাই তাঁর মনে পড়ছে বারবার কিন্তু তিনি ফিরে গেছেন সুদূর অতীতের দৃশ্যে। তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে আনন্দের হাসি।



জেটিঘাট

তিনখানা খড়ের নৌকো লিজ নিয়েছে দানসা, আর ফেরিঘাটের টিকিট কাটে ওমর। দুজনে এক ছাউনির নিচে বসে।

দানসার খাটুনি বেশি, কারণ কাববারটা তার নিজেব। এক সিজনের জন্য নৌকোগুলো সে লিজ নিয়েছে, এপার থেকে ওপারে খড় বোঝাই করে চালান দেয়। কখনও ইট কিংবা আলুর বস্তাও যায়। পাঁচজন মজুব খাটাতে হয়। নৌকোগুলোতে খড় কিংবা অন্য মাল বোঝাই করার সময় সে নিজেও হাত লাগায়, জোয়ারের সময় কোমর জলে নামতে হয়। নৌকোগুলো ছেড়ে গেলে সে ছাউনিতে বসে একটু জিরোয়।

ওমরের কাজ খুবই হালকা। নদী শান্ত থাকলে দিনে বড়জোর দুবার করে ফেরি যায়। তাও প্যাসেঞ্জার লঞ্চ নয়, বার্জ। গাড়ি, লরি, টেম্পো পারাপার করে। সবকারি ব্যবস্থা। কাছেই সমুদ্র, জোরে বাতাস বইলে এখানকার জলেও সমুদ্রের মতন ঢেউ ওঠে, তখন জেটির কাছে বার্জ ভিড়তে পারে না। সেই সময় পারাপার বন্ধ। ওমরের কাজ চুপচাপ বসে বিড়ি টানা। সেই ঢেউয়ের মধ্যেও দানসার নৌকোগুলো ঠিক চলে যায়, কাজ বন্ধ হলেই তার ক্ষতি।

যখন বাতাস থাকে না, মেঘ থাকে না, তখন ঠাটা-পোড়া রোদ। সেই-জন্য দানসা একটা ছাউনি বানিয়ে নিয়েছে। আল্‌গা ইটের দেওয়াল, ওপরে একটা তেরপল বেছানো, মেঝেতে খড় পাতা। রাত্তিরে এখানে

শুয়ে থাকাও যায়।

একবার বার্জ ছেড়ে গেলে ফিরতে ফিরতে দু-আড়াই ঘণ্টা লেগে যায়। তখন ওমর পা ছড়িয়ে নদীর দিকে চেয়ে বসে থাকে। মোহনার কাছাকাছি নদী, তাই সারা বছরই অতি জীবন্ত। ভাটার সময় নেমে যায় অনেকখানি, আর জোয়ারের সময় ছলাৎ ছলাৎ করে ঢেউ একটু একটু এগিয়ে আসে। কাদার ওপর গেঁথে যাওয়া নৌকোগুলোকে জিভ দিয়ে দিয়ে চাটে। জেটির ওপর জল লাফিয়ে উঠে আসে অনেকখানি।

নদী ছাড়া কিছু মানুষজনও দেখা যায়। কাছাকাছি দশ-বারোজন সকাল থেকে জাল পাতা আর জাল তোলার কাজে ব্যস্ত থাকে। আজকাল বাগদা চিংড়ির পোনার খুব চাহিদা। দামও ভালো পাওয়া যায়। প্রায় আলপিনের মতো সাইজ, তাও স্বচ্ছ, খালি চোখে বলতে গেলে দেখাই যায় না, সেই চারা-চিংড়িও এরা আজকাল ধরতে শিখেছে। অন্য মাছ ধরার আগ্রহ নেই কারুর।

নতুন জেটি হয়েছে। তাই নতুন বসতি, অন্য জায়গা থেকে জেলেরা এসে ঝুপড়ি বেঁধেছে এখানে। জলে নেমে যারা যারা জাল পাতে, তাদের মধ্যে জনা-পাঁচেক স্ত্রীলোক, বুক নেই, পাছা নেই, যেন শিল-নোড়ায় বাটা চেহারা, চাবুক খাওয়া মুখ। ওদের মধ্যে একমাত্র আমিনাই খানিকটা চলনসই, তাও আহামরি কিছু নয়। চোখ দুটো কুতকুতে, তবু মুখে একটা তেলতেলে ভাব আছে, আর উরুর গোছটা ভালো। সকালবেলা যখন কাদার মধ্যে নেমে নাইলনের লম্বা, বেড়াজালের খুঁটিগুলো বাঁধে আমিনা, তখন সে তার কস্তাডুরে শাড়িটা গাছ-কোমর করে পরে থাকে। জোয়ার আসার পর জল একটু একটু করে বাড়তে থাকে, আমিনাও তার শাড়িটা একটু একটু উঁচুতে গুটিয়ে নেয়। পায়ের ডিম ছাড়ায়, হাঁটু ছাড়ায়, উরুর মাঝামাঝি পর্যন্ত উঠে যায়। তারপর সে শাড়িটা আবার নামায়, একসময় তার বুক-জল হয়ে যায়। শাড়ি তার ভিজবেই, নদীতে নেমে জাল পাতবে অথচ পরনের কাপড় ভিজবে না, এ কখনও হয়? তা হলে প্রথম থেকেই সে শাড়ি না ভিজিয়ে উরু পর্যন্ত তোলে কেন? ওমর এ রহস্যটা বুঝতে

পারে না।

প্যাসেঞ্জার লঞ্চের জেটি আলাদা, সেখানে লোকজন বেশি, কিছু দোকান-পাটও আছে। লঞ্চ চালায় প্রাইভেট কোম্পানী, তারা যাত্রীবোঝাই করে লঞ্চ ছাড়ে, বেশি প্যাসেঞ্জার হয়ে গেলে একস্ট্রা ট্রিপ দেয়। আর এই বার্জের জেটিতে আসে শুধু কিছু লরি আর টেম্পো, কদাচিৎ দু-একখানা প্রাইভেট লরি। দশ-বারোজন জেলে-জেলেনী ছাড়া অন্য মানুষজন প্রায় দেখাই যায় না।

একখানা মারুতি ভ্যান গাড়ি জোরে চালিয়ে এসে সোজা চলে গেল জেটির শেষ প্রান্তে। গাড়ি থেকে নামল লাল গেঞ্জি পরা এক ছোকরা। জেটির গায়ে যাতে বার্জ বা লঞ্চের সরাসরি ধাক্কা না লাগে সেইজন্য কয়েকটা টায়ার বাঁধা আছে। সেইরকম একটা টায়ার ধরে লাফিয়ে বার্জটায় উঠে গেল ছোকরাটি। দূরের ছাউনিতে পা ছড়িয়ে বসে ওমর দেখছে। দানসা একটু আগে একটা খড়ের নৌকো বোঝাই করে ছেড়েছে, পরিশ্রম হয়েছে খুব, সে একপাশে এলিয়ে শুয়ে আছে খড়ের গাদায়।

লাল গেঞ্জিপরা ছোকরাটি আবার লাফিয়ে জেটিতে নেমে জোরকদমে এদিকে ফিরে এল। টিকিটঘর বলে কিছু লেখা নেই, ওদিককার প্যাসেঞ্জার-ফেরির মতন এদিকে টিকিটঘরও নেই, সরকারি ব্যবস্থায় ওমরের শুধু একটা টুল পেতে বসে থাকার কথা, সেটাই অফিস।

ছোকরাটি এসে একশ টাকার একটা নোট বার করে বলল, গাড়ির জন্য কত লাগে, ষাট না আশি ?

ওমর টাকার প্রতি কোনোও আগ্রহ না দেখিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, আজ আর যাবে না। ছোকরাটি রীতিমতন চমকে গিয়ে বলল, যাবে না ? কেন ?

ওমর বলল, যাবে না, যাবে না!

ছোকরাটি এবার গর্জন করে উঠে বলল, ভালো করে মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বল! বার্জ জেটিতে লেগে আছে, অথচ তুমি বলছ যাবে না, তার মানে ?

গর্জন শুনে একটুও বিচলিত হলো না ওমর। অবজ্ঞার সঙ্গে গাল চুলকোতে চুলকোতে বলল, জাহাজ থাকলেই যেতে হবে? সাড়ে বারোটায় বান আসবে। তখন ওপারের জেটি পুরো ডুবে যাবে। আপনার গাড়ি ওপারে গিয়ে নামাবেন কোথায়? মাঝ গঙ্গায়?

ছোকরাটির ক্রোধের সঙ্গে এবার মিশল বিস্ময়। হাতঘড়ি দেখে সে বলল, এখন এগারটা দশ। ওপারে যেতে কতক্ষণ লাগে আমি জানি না? বড়জোর পঁয়তিরিশ মিনিট। বান আসার সঙ্গে কী সম্পর্ক আছে? আমায় টিকিট দাও!

—হবে না!

—তার মানে? টিকিট দেবো না?

—একখানা গাড়ি পার হয় না। পেছনে গিয়ে অপেক্ষা করুন, আরও অন্তত দুখানা গাড়ি না এলে জাহাজ ছাড়বে না।

—যদি আর গাড়ি না আসে?

—তাহলে যাবে না!

—অন্য গাড়ি আসতে আসতে যদি বান এসে যায়?

—বলেছি তো, যাবে না!

ছোকরাটি এবার অসহায়ভাবে এদিক ওদিক তাকাল। তার অদম্য ইচ্ছে হচ্ছে এই শুকনো, ঢ্যাঙা লোকটার মুখে দুখানা ঘুসি কষাতে। কিন্তু তাতে তার সমস্যার সমাধান হবে না। সারেং-এর সঙ্গে সে কথা বলে এসেছে। সারেং-এর যেতে আপত্তি নেই, কিন্তু টিকিটবাবু টিকিট না দিলে সে বাজ ছাড়তে পারবে না।

ছোকরাটি এবার মেজাজ সামলে বলল, অন্য গাড়ি যদি না আসে—আমার খুব বিপদ হয়ে যাবে। আমাকে আজ ওপারে যেতেই হবে। ওমর পিচ করে একপাশে থুতু ফেলে বলল, একখানা গাড়ি নিয়ে জাহাজ ছাড়ার নিয়ম নেই, বললাম তো!

ছোকরাটি আরও অনুনয় করে বলল, একটু ব্যবস্থা কর। আমার বিশেষ দরকার। একজনের অসুখ। তুমি না হয় পুরো একশ টাকাই রাখ!

ওমর এবার খেঁকিয়ে উঠে বলল, কেন জ্বালাতন করছেন? অন্তত তিন-খানা গাড়ি না হলে আমি টিকিট দেবো না, ব্যস্!

ওমর পেছন ফিরে বসে বিড়ির বাণ্ডিল খুঁজতে লাগল।

ছোকরাটি সরে গেল এবার। অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল জেটিতে। মাঝেমাঝেই রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে। আর কোনোও গাড়ির চিহ্ন নেই।

ওমর বিড়ি ধরিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

দানসা সব শুনছিল। এবার সে জিজ্ঞেস করল, ভদ্রলোককে টিকিট দিলি না কেন রে?

ওমর বলল, একখানা গাড়ির জন্য জাহাজ ছাড়বে? মোটে আশি টাকা এক গাড়ি, আর কত টাকার ডিজেল পুড়বে তা জানিস?

দানসা বলল, ডিজেল পুড়বে তো গভর্নমেন্টের!

—আমি জেনেশুনে গভর্নমেন্টের ক্ষতি করব? কোম্পানি কা মাল দরিয়ামে ঢাল?

—আরে, গভর্নমেন্ট কি লাভের জন্য ফেরি চালাচ্ছে? চালাচ্ছে মানুষের উপকারের জন্য। রেল নেই, বাস নেই, ব্রীজ নেই, মানুষ ওপারে যাবে কী করে? তাই গভর্নমেন্ট বিনালাভে এই ব্যবস্থা করেছে। পাঁচখানা গাড়িও যদি যায়, পাঁচ আশি হল গে চারশ, তাতেও কি এক টিপের খরচ ওঠে? ডিজেল খরচ, সারেং, সাতজন হেল্পার···

—তবু গভর্নমেন্টের আইন আছে, মোটে একখানা গাড়ি হলে জাহাজ যাবে না।

—পরশুদিন তুই ব্রজেন সাহার লরি পার করালি। সেও মোটে একখানাই ছিল। ব্রজেনের সঙ্গে তোর খাতির আছে।

বেশ করেছি! আমার ইচ্ছে। গভর্নমেন্ট আমাকে এখানে রেখেছে, আমি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব।

—সে তো ঠিক। এই বাবুটা বলল, ওর বড় বিপদ। ছ্যাখ না কেমন ছট-ফট করছে।

—আরে রাখ! ঠেলায় পড়লে অমন বিপদের কথা সবাই বলে।
—শেষকালে তোর কাছে কাকুতি-মিনতি করল, দিয়ে দে না টিকিট। মানুষের উপকার হবে।
—হ্যাখ দানসা, এই লোকটার সঙ্গে যদি হাটে-বাজারে আমার দেখা হতো, ভালো করে কথা বলত আমার সঙ্গে, আমাকে মানুষ বলে গ্রাহ্য করত ; ভাবভঙ্গি দেখে বুঝলি না? প্রথমেই কেমন চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলছিল!
এবার দানসাও হেসে ফেলল।
সত্যি কথাই তো, এই জেটিঘাট থেকে উঠে গেলে রাস্তায় হাটে-বাজারে ওমর একজন অতি সাধারণ নিরীহ মানুষ। লম্বা, সিড়িঙ্গে চেহারা, একজন এলেবেলে গরিব। শুধু এই জেটিঘাটে বসে টিকিট দেবার সময়েই তার যত তেজ। গাড়িওয়ালা বাবুদেরও সে ফিরিয়ে দিতে পারে। ওমর এই ক্ষমতাটা উপভোগ করে। ঐ লাল গেঞ্জি পরা ছোকরা ওকে কুড়ি টাকা ঘুষ দিতে চেয়েছিল, ওমর তাও নিল না, ওকে নিরাশ অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়ে ওমর কুড়ি টাকার চেয়ে বেশি আনন্দ পেয়েছে।
দানসা তবু আবার বলল, আজ হাট বন্ধ। আজ আর গাড়ি আসবে না। বান ডাকার আগে লোকটাকে পার করে দে না, ওমর। মানুষের উপকার করলে নিজেরও উপকার হয়। মনটা ঠাণ্ডা হয়।
ওমর বলল, আছে। এই শালারা নিমকহারাম হয়। আজ উপকার করব, কাল দেখবি এসে আবার চোখ রাঙাবে।
দানসা বলল, আহারে, হ্যাখ হ্যাখ, লোকটা বোধহয় এবার ভিরমি খেয়ে পড়বে। খুব দরকার না হলে···দে দে, একটা টিকিট দে।
ওমর এবার হাতছানি দিয়ে ছোকরাটিকে ডাকল। সে আগে থেকেই একটা কুড়ি টাকার নোট বার করে রেখেছিল, ঘুষের জন্য নয়, বিনা কারণে লোকটির উপকার করেছে, এটা বুঝিয়ে দিয়ে, টিকিটটা বাড়িয়ে বলল, যান, যান, দৌড়ে চলে যান।
লোকটা যে এতক্ষণ অনিশ্চয়তায় কষ্ট পেয়েছে, তাতেও ওমরের কম

আনন্দ হয়নি ! ছাউনির মধ্যে রান্নার কোনোও ব্যবস্থা নেই, দুপুরের দিকে ওরা অন্য জেটিঘাটের হোটেলে খেতে যায়। একটা মুসলমানের হোটেল, অন্য হোটেলটায় সেরকম কিছু লেখা নেই। রাত্তিরের দিকে নিরিবিলি থাকে, তখন ওমর আর দানসা অন্য হোটেলটায় খায়, ওখানে রান্না ভালো, ম্যানেজারটাও মজলিসি ধরনের। দিনের বেলা যাত্রীদের খুব ভিড় থাকে, তাই ওখানে না গিয়ে ওরা মুসলমান হোটেলেই ঢোকে। এখানে খাবার একটু সস্তা, কিন্তু মালিকটা তিরিক্ষি মেজাজের, কোনোও রান্না নিয়ে অভিযোগ করলেই সে দাঁত খিঁচিয়ে বলে ওঠে, না পোষায়, এস না! কাছাকাছি আর কোনোও মুসলমানের হোটেল নেই। ব্যাটা সেই সুযোগটা নেয়।

আটখানা করে রুটি, এক প্লেট শুকনো গোস্ত আর পেঁয়াজ দিয়ে ওরা খাওয়া সেরে নিল। ওমর দই নিল, দানসা দই খায় না।

দাম দিয়ে বেরিয়ে আসার পর পাশের দোকানের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে দানসা বলল, তোর আর আমার কাছ থেকে সমান পয়সা নিল কেন রে? তুই দই খেলি।

ওমর এক গাল হেসে বলল, চেপে যা। ও শালা মালিকটা ভুলে গেছে। আমার আজ একটা টাকা লাভ।

দানসা বলল, ভুল করে দাম নেয়নি। এঃ হে, ওর ক্ষতি হয়ে গেল। দই তো ও বাজার থেকে কিনেছে। যা, ওমর, টাকাটা দিয়ে আয়।

ওমর চোখ কপালে তুলে বলল, ফেরত দিতে যাব? তোর মাথা খারাপ?

—দিবি না? দই খেয়েছিস, তার দাম দিবি না?

ও নেয়নি কেন? সেটা আমার দোষ নয়। একদিন আমি সাতখানা রুটি খেয়েছিলুম, ও হিসেবে ধরেছিল ন'খানা। তোর মনে নেই? কিছুতেই আমার কথা বিশ্বাস করল না? চল্লিশ পয়সা বেশি নিয়ে নিল।

—ও ভুল করেছিল। তা বলে তুই জেনে শুনে ওকে ঠকাবি? একটা টাকার জন্য পাপ করবি?

—ত্যাখ দানসা, তুই শালা আমার বিবেক নাকি? সবসময় আমার

পেছনে টিকটিক করিস কেন বল্ তো ?

—তুই যদি নিজের থেকে টাকাটা ফেরত দিতে যাস, দেখবি ও যেমন অবাক হবে, তেমন খুশি হবে। মানুষকে খুশি করার মতন পুণ্যি কি আর কিছুতে হয় ? যা, যা। একটা টাকার তো মোটে মামলা।

ওমর আরও কিছুক্ষণ তর্ক করে। বিরক্তিতে তার কপাল কুঁচকে যায়। তবু সে একসময় দানসার কাছে হার মানে, হোটেলের কাউন্টারে গিয়ে একটা টাকা ছুঁড়ে দিয়ে আসে।

পান খেয়ে গল্প করতে করতে হাঁটে দুজন। সরকারি জায়গায় অনেক ঝুপড়ি উঠে গেছে। আরও নিত্যনতুন গজাচ্ছে। কিছুদিন আগে জায়গাটা ছিল ফাঁকা। শিগগিরই এটা একটা গঞ্জ হয়ে যাবে। দূর দূর গ্রাম থেকে যে-যেমন পারে জায়গা দখল করে নিচ্ছে। ওমর আর দানসারও দুটো জায়গা নেওয়া আছে, কিন্তু ঘর তোলেনি। এখানে সংসার পাতার কথা কখনও ভাবেনি। ওমরের নতুন চাকরি, আর দানসা তার কারবারে এখনও বিশেষ লাভের মুখ দেখেনি।

একটা ঝুপড়ির বাইরে আমিনা এঁটো-কাঁটা খাওয়াচ্ছে কুকুরকে। এখন একটা শুকনো শাড়ি পরেছে, চুল আঁচড়াচ্ছে। সকালবেলা যখন জলে জলে থাকে, তখন একে অন্যরকম দেখায়। ডিজেল হাঁড়ির মতন গায়ের রঙ, নাকটা বোঁচা, তবু মেয়েটার একটা কিছু চটক আছে।

সবাই এখানে নতুন এসেছে, কেউ কারুকে ভালো করে চেনে না! আমিনাদের ঝুপড়িতে থাকে এক বুড়ো আর একটা যোল-সতের বছরের ছেলে। ছেলেটা ওর ভাই আর বুড়োটা ওর স্বামী। একটা পিঠ-ব্যাঁকা বুড়োর সঙ্গে কেন ওর বিয়ে হলো কে জানে! বুড়োটা মাঝেমাঝেই খকখক করে কাশে। তবু তেজ আছে, আমিনাকে বকে প্রায়ই, ভাইটাকেও বকে।

ওমর ভাবল, এই আমিনাকে সুযোগ বুঝে একদিন অন্য কেউ খাবে। বিয়ে হয়ে গেলেই যে সে স্ত্রীলোককে অন্য কেউ খাবে না, তার কোনোও মানে নেই। অন্তত এখানে ওসব নিয়ম খাটে না। বুড়োর যুবতী স্ত্রী, তার ওপর কেউ না কেউ ভাগ বসাতে চাইবেই। এখন কথা হচ্ছে, কে

আগে খাবে!

ওমরের শরীরটা চনমন করে ওঠে।

দানসা তার কাঁধে হাত রেখে বলল, ঐ আমিনার দিকে নজর দিস না যেন!

ওমর দারুন চমকে গিয়ে বন্ধুর দিকে তাকাল।

দানসা আবার বলল, ওর ভাইটাকে দেখেছিস তো, খুব গোঁয়ার। বয়েস কম হলে কী হয়, শরীরে তাগদ আছে। আর বুড়োটার নজরও খুব সরু। দেখিস না, আমিনাকে কারুর সঙ্গে কথা বলতে দেয় না!

ওমর বলল, আমার নজর দিতে ভারি বয়ে গেছে।

দানসা বলল, গভর্নমেণ্টের চাকরি পেয়েছিস, তোর আর চিন্তা কী? এবার বিয়ে-শাদী কর।

ওমর ঠোঁট ও্ল্টাল। মাইনে তিনশ চল্লিশ টাকা। ঐ টাকায় সংসার হয়? আগে কিছু জমুক।

দানসা বলল, ডাগর-ডোগর দেখে বউ আনবি, তাকে দিয়ে কাজ করাবি। পানিতে নেমে মাছ ধরতে শিখলেই টাকা আসবে। মেয়েছেলেরা এই কাজ ভালো পারে। তারপর কাচ্চা-বাচ্চা হবে। আল্লা দোয়া করবেন। নিজের ছেলেপুলে না হলে পুরুষমানুষের মন শান্ত হয় না।

ওমর বলল, রাখ, ও কথা রাখ!

আমিনা মেয়েটি সত্যিই কম কথা বলে। কারুর সঙ্গে মেশে না। সামনা-সামনি চোখাচোখি হলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু নদীতে জাল ফেলতে নেমে যখন একসময় শাড়ি ভেজাতেই হবে, তবু কেন সে অল্প জলে উরু পর্যন্ত শাড়ি গুটিয়ে রাখে, এটাই ওমর বুঝতে পারে না।

কয়েকটা দিন একঘেয়ে যাবার পর ওমর ছটফটিয়ে উঠল। কারুর ওপর সে ব্যক্তিত্ব ফলাতে পারছে না, কারুর কাকুতি মিনতি অগ্রাহ্য করার আনন্দ পাচ্ছে না। আজ আবার বন্ধ। ডায়মণ্ডহারবারে কী যেন গণ্ড-গোল হয়েছিল কাল, তার জন্য সারা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বন্ধ। এই ফেরিঘাটের সঙ্গে ডায়মণ্ডহারবারের ঝঞ্ঝাটের কোনোও সম্পর্ক নেই।

তবু ভয়েই আজকাল সবাই দোকানপাট বন্ধ করে দেয়। প্রাইভেট কোম্পানির প্যাসেঞ্জার লঞ্চ চলবে না, হোটেলেও ঝাঁপ ফেলা। শুধু বার্জ সার্ভিস চালু রাখার কথা, কারণ সেটা সরকারি। যদি গাড়ি আসে পারাপারের জন্য। সে সম্ভাবনা খুবই কম।

জেলেরা বন্ধ-হরতাল মানে না। তারা সবাই জলে নেমেছে।

ওমর জেটিঘাটের মাঝখান পর্যন্ত হেঁটে গেল। আমিনা আর অন্য দুটি স্ত্রীলোক সেখানে জাল ছড়াচ্ছে। সবাই জালের একটা দিক জেটির সঙ্গে বাঁধে।

ওমর গম্ভীরভাবে বলল, এই, এখান থেকে জাল সরাও! জাল সরাও! মেয়েরা অবাক হয়ে তাকাল। প্রতিদিন জাল বাঁধা হচ্ছে, এরকম কথা কখনও শোনেনি। ওমর বলল, জাল সরাও! হাঁ করে দেখছ কী?

একটি স্ত্রীলোক বললে, কেন? জাল খাটাব না কেন?

ওমর বলল, এটা সরকারের সম্পত্তি। এখানে জাল বাঁধার কে হুকুম দিয়েছে?

স্ত্রীলোকটি ঠিক বুঝতে না পেরে বলল, নদীর পানি সরকারের সম্পত্তি? মাছ ধরা যাবে না?

ওমর ধমক দিয়ে বলল, কোথাকার উজবুক হে! নদীর পানি সরকারের, তা কি আমি বলেছি? এত বড় নদী, যেখানে ইচ্ছে মাছ ধর গে, কে বারণ করছে? এই জেটির সঙ্গে বাঁধা চলবে না। আমার জাহাজ যাওয়া-আসার অসুবিধে হয়। খোল, খোল!

সবাই জেটির সঙ্গে জালের একটা দিক বাঁধে। তারপর পরপর খুঁটি চলে যায় অনেকদূর পর্যন্ত জেটির মতন এমন মজবুত খুঁটি তো আর হয় না। এখন সব খুলে আবার বাঁধতে হবে? স্ত্রীলোকেরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকায়। আমিনা শুধু জলের দিকে চেয়ে থাকে।

অন্য জেলেরাও কাছাকাছি চলে আসে। আমিনার স্বামী আর ভাইও আসে। কেউ কেউ তর্ক জুড়ে দেয়। কিন্তু ওমর অনড়। সে সরকারের

প্রতিনিধি, সরকারের সম্পত্তি সে অন্যদের ইচ্ছেমতন ব্যবহার করতে দেবে না।

খানিকক্ষণ তর্কের পর বেশ মেজাজ দেখিয়ে ওমর বলল, অত কথা কিসের? নিজেরা খুলবে, না আমি খুলে দেবো?

সত্যিই সে একটা জালের দড়ি খোলার জন্য টান মারে।

দানসা একটা নৌকোয় খড় বোঝাই করছিল। সেও বন্ধ মানেনি। একটা নৌকো তো ওপারে যাক। ওদিকের বাবুরা যদি আটকায়, তাহলে সে আর অন্য নৌকো ছাড়বে না আজ।

গোলমাল শুনে কোমরজল ঠেলে ঠেলে জেটির কাছে এসে সে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে?

আমিনার স্বামী বলল, জেটিতে জাল বাঁধা যাবে না বলছে।

দানসা ওমরের দিকে তাকাল।

ওমর যুক্তি দেখিয়ে বলল, এরা সব জাল বেঁধে রাখে। আমার জাহাজ যাওয়া-আসার অসুবিধে হয়।

একজন জেলে বলল, জাহাজ লাগার সময় তো আমরা জাল খুলে নিই। জাহাজের চাকা লাগলে জাল ছিঁড়ে যাবে।

ওমর বলল, হ্যাঁ, জাল খুলে নাও, কিন্তু কখন খোলো? জাহাজ কাছে এসে ভেঁপু মারে। তার আগে তোমাদের হুঁশ হয় না। ভেঁপু শুনে তার-পর তোমরা জাল খুলতে শুরু কর। তাতে আমাদের টাইম নষ্ট হয়। গভর্নমেন্টের টাইমের বুঝি দাম নেই? অ্যাঁ? দানসা বলল, হ্যাঁ, সেটা ঠিক কথা। সরকারের টাইমের দাম আছে। কিন্তু জেলেদের যাতে সুবিধে হয়, সেটাও তো সরকার দেখবে। জাহাজ তো দুবার মাত্তর আসে যায়। সারাদিন জেটি খালি পড়ে থাকে। জেটিতে জাল বাঁধলে জেলেদের সুবিধে হয়, ঠিক কিনা? সরকার তো সেটাও দেখবে?

—তবে ওরা জাহাজ আসবার আগে আগে জাল খুলে নেয় না কেন?

—সেটাও ঠিক। ওগো, জাহাজ যখন ওপার থেকে মাঝনদী পেরুবে, তখন জাল খুলতে শুরু করবে। হিসেব করে। পারবে না?

অনেকেরই এই সমাধান মনোমতন হলো।

ওমর এবার সবার মুখের দিকে তাকাল। মুখের ভঙ্গিটা উদার হয়ে গেল। বিচারের রায় দেবার সুরে সে বলল, ঠিক আছে, তাহলে এবার আমি পারমিশান দিতে পারি। কিন্তু মনে থাকে যেন, ঠিক সময়ে—।

এই খুদে সাম্রাজ্যের সম্রাটের মতন ধীর পা ফেলে ওমর ফিরে যায় নিজের ছাউনিতে। পরম তৃপ্তির সঙ্গে বিড়ি ধরায়।

দুপুরবেলা একটা কাণ্ড ঘটল।

চতুর্দিক নিস্তব্ধ, নদীর ওপর হা-হা করছে বাতাস, একটাও নৌকো চলছে না। খড়ের ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছে দানসা আর ওমর। একজনের ঘুমঘুম ভাব, অন্যজন বিড়ি টেনে যাচ্ছে। এমন সময় দরজার কাছে এসে দাঁড়াল আমিনা। কলাপাতা চাপা দেওয়া একটা ডেকচি নামিয়ে রাখল মেঝেতে।

ওমর তড়াক করে উঠে বসে বলল, ওটা কী?

কলাপাতাটা উঠিয়ে দিল আমিনা। এক ডেকচি ভর্তি ভাত, তার ওপরেই একপাশে খানিকটা ঝিঙে-পোস্ত, আর একপাশে লট্‌কা মাছের চচ্চড়ি।

মৃদুস্বরে আমিনা বলল, আজ তো হোটেল বন্ধ।

দানসার গ্রামের বাড়ি সতের মাইল দূরে, আর ওমরের বাড়ি বসিরহাট। একদিনের ছুটিতে দানসা বাড়ি যাবার চাড় অনুভব করে না। আর ওমরের তো ঠিক ছুটিও নয়। কিন্তু যারা হোটলে খায়, বনধের দিনে তাদের আহার জুটবে কী করে? সে কথা কেউ ভাবে না। দানসা একছড়া কলা কিনে রেখেছে, তাই খেয়ে খিদে মেটাবে। ওমর কিছু ভাবেইনি।

দানসা বলল, হোটেল বন্ধ বলে তুমি আমাদের জন্য ভাত নিয়ে এসেছ? তোমায় কে পাঠাল?

আমিনা কোনো উত্তর দিল না।

দানসা আবার বলল, তুমি কী ভালো মেয়ে গো! আমরা দুটো মন্দ এখানে না খেয়ে পড়ে আছি, তুমি ঠিক নজর করেছ?

ওমর ভাবল, কার কথা বেশি ভেবে খাবার এনেছে আমিনা? দানসাটা কি মনে করছে ওর জন্য? দানসা আজ ওদের হয়ে ওকালতি করছিল, সেইজন্য? গাধা আর কাকে বলে! উকিল বড়, না হাকিম বড়? আমিনারা বুঝেছে যে ওমরকে খাতির না করলে এই জেটির ধারে মাছ ধরা যাবে না।

আমিনা বলল, আমি পরে এসে বাসনটা নিয়ে যাব।

দানসা বলল, আমি ধুয়ে পৌঁছে দেবো। তোমাকে আসতে হবে না।

ওমর ফস্ করে বলল, তোমরা তো রোজ রান্না কর, আমরা চাল কিনে দিলে দুটো ভাত ফুটিয়ে দেবে?

দানসা অবাক হয়ে ওমরের দিকে তাকাল।

ওমর বলল, ওরা রেঁধে দিলে আমাদের আর রোজ রোজ হোটেলে খেতে হয় না। আমরা পয়সা দেবো। চাল ডাল কিনে দেবো।

দুজনেই তাকাল আমিনার দিকে। আমিনা মাথা হেলিয়ে বলল, হ্যাঁ, দেবো না কেন?

এরপর থেকে একটা ভালো ব্যবস্থা হয়ে গেল, দানসা আর ওমরকে হোটেলে যেতে হয় না। আমিনা কিংবা তার ছোটভাই এসে খাবার দিয়ে যায়। ওমর আর দানসা পালা করে বাজার করে আনে। আমিনার স্বামীও খুশি, কারণ ওমর ওদের দই খাওয়ায়। বুড়ো দই খেতে খুব ভালবাসে। আমিনা এখনও বেশি কথা বলে না বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে স্থির দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকায়। সেই দৃষ্টির সঠিক ভাষা ওমর বোঝে না, কিন্তু তার শরীর ঝনঝন করে। তার তুলনায় দানসা ওদের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা পাতিয়েছে বেশি। দানসা মাঝে মাঝে আমিনাকে রান্নাবান্নায় সাহায্য করে। মজার কথা বলে। আমিনার ভাইটা তার বেশ ন্যাওটা। এক-একদিন আমিনা বিকেলের দিকে কোথায় যেন যায়। একটু সেজেগুজে। ওমরের পছন্দ হয় না। এখান থেকে বাজার সাত মাইল দূরে। ওমর আর দানসার একটা ভাগাভাগির সাইকেল আছে। আমিনা কি বাজারে যায়? কেন যায়? ভাইটাকে পাঠালেই তো পারে। ওমরের

সন্দেহ হয়, আমিনা যেন অন্য কারুর মুখগহ্বরের দিকে এগোচ্ছে। তাহলে ওমর নয় কেন ?

দানসা অবশ্য প্রশংসা করে খুব আমিনার। মেয়েটার স্বভাব-চরিত্র ভালো, এদিক ওদিক চায় না। যাত্রী ফেরিঘাটের লোকজনের সঙ্গে ফচকেমি করে না। মাছের পাইকারদের সঙ্গে দরাদরিতে সে ওস্তাদ, কিন্তু ওরা অন্য কোনোরকম সুবিধে নিতে পারে না।

সকালবেলা পুরো জোয়ার আসার আগে আমিনা প্রতিদিন উরু দেখায়। ওমর এক-একদিন জেটির মাথায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আমিনা তবু লজ্জা পায় না! ওমরের মাথায় আগুন জ্বলে। দানসার কথা মতন যদি ভালো মেয়েই হয়, তাহলে উরু ঢেকে রাখে না কেন ?

একদিন বিকেলবেলা আমিনার স্বামী হঠাৎ খুব বমি করতে লাগল। প্রথম কয়েকবার কেউ তেমন খেয়াল করেনি। একসময় জেটির ওপর উঠে এসে নেতিয়ে পড়ল একেবারে। মনে হলো চোখ উল্টে যাচ্ছে। নির্ঘাত কলেরা। প্যাসেঞ্জার লঞ্চ চলে গেল এইমাত্র। ফিরতে ফিরতে অন্তত আরও দেড় ঘণ্টা। ওদের একটা লঞ্চ আজ খারাপ। নদীর জলে খুব টান আছে। নৌকোয় যেতে অনেক সময় লেগে যাবে। অথচ বুড়োকে এক্ষুনি ওপারে নিয়ে যাওয়া দরকার। সাগরদ্বীপে চালু হেল্‌থ সেণ্টার আছে। সেখানে ওর চিকিৎসা হতে পারে।

বার্জে দুটো লরি আর তিনটে ভ্যান চেপেছে। ছাড়বে এক্ষুনি আমিনার ভাই সারেংকে অনুরোধ করেছিল তার দাদুভাইকে নিয়ে যাবার জন্য কিন্তু সারেং কলেরা-রোগী তুলতে রাজি নয়।

এগিয়ে এলো ওমর। সারেংকে ডাকল। গম্ভীরভাবে বলল, মনে কর, আমার বাপের কলেরা হয়েছে, তুমি তাকে নিতে না ?

সারেং তো-তো করতে লাগল।

ওমর একজন খালাসিকে ডেকে বলল, গণেশ, ওপারে নিয়ে গেলেই শুধু চলবে না। ওরা হেল্‌থ সেণ্টার চেনে না। ওখানে পৌঁছে দিবি।

গণেশ জিজ্ঞেস করল, ওনার সঙ্গে আর কে যাবে ?

আমিনাই যেতে চায়। সে বুড়োর মাথা কোলে নিয়ে বসে আছে। কিন্তু ওমর বলল, তোমার যাওয়া ঠিক হবে না। তোমার ভাই যাক। একজন পুরুষমানুষ সঙ্গে থাকলে সুবিধে হয়।

ভাই-বোন দুজনেই চলে গেলে আমিনাদের ঘর কে দেখবে? এখানে চোরের খুব উৎপাত। বুড়োর সঙ্গে আমিনার ভাইটাকে পাঠানো ঠিক হলো! বার্জে উঠে ওমর নিজে বুড়োকে শুইয়ে দেবার ব্যবস্থা করল। বাজ এবার ছাড়বে। সারেং ওমরকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করল, আজ কি আবার ফিরতে হবে? একেবারে কাল সকালে ওদিককার গাড়ি নিয়ে চলে আসতাম? রাত্রে ওখানে আমার একটা কাজ ছিল।

ওমর কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল। ভোরবেলা এখান থেকেই প্রথম গাড়ির ফেরি ছাড়ার কথা। কিন্তু একদিন দেরি হলে ক্ষতি কী? সন্ধ্যের পর প্যাসেঞ্জার লঞ্চ বন্ধ। বুড়োকে হেল্‌থ সেন্টারে ভর্তি করে আমিনার ভাইটা যদি ফিরতে চায়, কিসে ফিরবে? ফেরার কি দরকার? ওপারে এই জাহাজেই রাত্রে শুয়ে থাকতে পারবে। খালাসিরা ওকে খাইয়ে দেবে।

ওমর সারেংকে বলল, ঠিক আছে, ফিরতে হবে না।

তার মানে, আজ রাতে আমিনা একা থাকবে। আজই সেই রাত। আজই বুঝতে হবে আমিনার উরু খুলে রাখার রহস্য।

এর মধ্যেই অন্ধকার হয়ে গেছে। জেটি পার হয়ে এসে একটা দৃশ্য দেখে ওমর থমকে গেল। আমিনার কাঁধে হাত দিয়ে, প্রায় তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছে দানসা। ঢুকে গেল আমিনাদের ঝুপড়ির মধ্যে।

দাঁতে দাঁত ঘষে ওমর বলল, শালা হারামি, কিন্তু এখন ওমর ওখানে যেতে পারে না। সে নিজেদের ছাউনিতে বসে গজরাতে লাগল। ধ্বংস করতে লাগল বিড়ির পর বিড়ি। হারামজাদা দানসাটার সঙ্গে আজ থেকে সম্পর্ক শেষ। কাল থেকেই ওমর নিজের জায়গাটায় একটা ঘর তুলতে শুরু করবে।

এক একটা মিনিট যেন এক এক ঘণ্টা। ওমর মাঝে মাঝে বাইরে এসে

উঁকি মারছে। চাঁদ ওঠেনি। আকাশ অন্ধকার। কোথাও মানুষজন নেই। আমিনাদের ঝুপড়িতেও কোনোও সাড়াশব্দ নেই। ওখানে কী করছে দানসা?

কতক্ষণ কাটল, এখন কত রাত?

এক সময় আমিনাদের ঝুপড়ির ঝাঁপ ঠেলে দানসা বেরুতেই ওমর সেদিকে ছুটে গেল। দানসার হাত চেপে ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল নিজেদের ছাউনির দিকে।

দানসা বলল, ব্যবস্থা করে এলুম, ফতি এসে রাত্তিরে আমিনাব ঘরে শোবে।

রাগের চোটে তোতলাতে লাগল ওমর। সে বলল, শালা···আমি ওদের পাঠিয়ে দিলাম, তুই, তুই আমার আগে, তুই আমিনাকে, তুই ওকে···

দানসা একগাল হেসে বলল, আমি যে তোর বিবেক!



যূথপতি

দরজায় বেলের শব্দ শুনে কয়েক মুহূর্ত উৎকর্ণ হয়ে রইলেন হেমকান্তি। কে দরজা খুলবে?

সাধারণত পরাণই খুলে দেয়। দ্বিতীয়বার বেল বাজবার পর হেমকান্তির মনে পড়লো পরাণ একটু আগে বাজারে গেছে। সে তো হেমকান্তিকে বলেই গেল। যখন বাড়িতে অন্য কেউ থাকে না, তখনই পোস্টম্যান কিংবা যত রাজ্যের ফেরিওয়ালা আসে, হেমকান্তিকে দরজা খুলতে যেতে হয়। আর পরাণটারও যখন-তখন বাজারে যাওয়া চাই!

খবরের কাগজ পড়ার মতন জরুরি কাজ ফেলে, চটি ফট-ফটিয়ে হেমকান্তি গেলেন সদর দরজার দিকে।

পোস্টম্যান কিংবা ফেরিওয়ালা নয়, মলয়।

সে একমুখ হেসে বললো, কেমন আছেন, মেসোমশাই? আপনার জ্বর হয়েছিল শুনেছিলাম।

হেমকান্তি বললেন, এখন ভালো আছি। জ্বর নেই আর।

মলয় আবার জিজ্ঞেস করলো, রিঙ্কি নেই? ওর সঙ্গে একটা দরকার আছে।

হেমকান্তি বললেন, না, রিঙ্কি তো এখন বাড়িতে নেই!

—কোথায় গেছে? ফিরতে দেরি হবে?

—ওর মা আর ও গেছে একটা শ্রাদ্ধবাড়িতে, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই

ফিরবে বোধহয়…

হঠাৎ হেমকান্তির খেয়াল হলো, তিনি মলয়কে দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। তাঁর কি ভীমরতি হয়েছে? ছি ছি, কী কাণ্ড!

তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, ভেতরে এসো, ভেতরে এসো, রোদ্দুরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছো কেন?

মলয়ের হাতে একটা পলিথিনের ঝোলা। মুখখানা একেবারে ঘর্মাক্ত। অসম্ভব গরম পড়েছে সকাল থেকেই।

ভেতরে এসে, বসবার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মলয় হাঁক দিল, পরাণ! পরাণ শোনো।

হেমকান্তি বললেন, পরাণও নেই, বাজারে গেল এক্ষুনি।

মলয় বললো, মোড়ের দোকানে সিঙাড়া ভাজছিল দেখলুম। বেশ ভালো সাইজ। কয়েকটা নিয়ে এলুম।

একটু আগে পাখা ঘুরছিল, এরই মধ্যে লোডশেডিং হয়ে গেছে।

মলয় ভেতরে এসে ওপরের দিকে তাকিয়ে বললো, পাখা চলছে না?

হেমকান্তি এমন একটা মুখের ভাব করলেন, যেন লোডশেডিং হওয়াটা তারই অপরাধ। গরমের মধ্যে ঘেমে নেয়ে এসেছে মলয়, তাকে তিনি একটু বাতাস দিতে পারছেন না। বাড়িতে হাতপাখাও নেই।

খবরের কাগজটা ভাঁজ করে হাওয়া করতে করতে মলয় বললো, ওরা আসুক, ততক্ষণ আপনি সিঙাড়া খান। গরম গরম আছে, ঠাণ্ডা হলে তেমন ভালো লাগে না।

নিজেই সে ঠোঙা বার করে বললো, মেসোমশাই, এই নিন।

এখন মেসোমশাই বলে ডাকছে, আর কয়েকমাস বাদেই মলয় ওঁকে বাবা বলবে। রিঙ্কির সঙ্গে ওর বিয়ের কথা পাকা হয়ে আছে।

বাড়িতে আর কেউ নেই, এখন হবু-জামাইকে আপ্যায়ন করার ভার সব হেমকান্তির ওপর। আর কি করবেন ভেবে না :পয়ে হেমকান্তি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি জল খাবে?

মলয় বললো, না। সিঙাড়ার সঙ্গে চা না হলে জমে না। পরাণ আসুক।

পরাণ যদি আসতে দেরি করে, তা হলে কি হেমকান্তিরই চায়ের জল চাপানো উচিত ? সত্যিই তো সিঙাড়ার সঙ্গে চা পেলেই ভালো লাগে। হেমকান্তি জীবনে কখনো বাড়ির এই সব কাজ করেননি। রান্নাঘরের কোথায় চা-চিনি থাকে, তিনি জানেনই না।

সিঙাড়া খেলেই তার অম্বল হয়। কিন্তু মলয় আগ্রহ করে দিচ্ছে, তাতে না বলা উচিত নয়। মলয় নিজেও খেতে শুরু করেছে। হেমকান্তিও দুটো খেয়ে নিলেন। একটু পরেই বুক জ্বালা করবে।

বাথরুমে হাত ধুতে গিয়েই বেরিয়ে এসে মলয় বললো, তোয়ালে নেই। না না, আপনাকে উঠতে হবে না, বসুন, বসুন মেসোমশাই। আমি নিয়ে আসছি।

মলয় ভেতরের ঘরে চলে গেল, নিয়ে এলো একটা তোয়ালে। এ বাড়িতে কোথায় তোয়ালে রাখা থাকে, তাও মলয় জানে।

কতক্ষণের মধ্যে রিঙ্কি আর তার মা ফিরবে, তার ঠিক নেই। এতক্ষণ মলয়ের সঙ্গে তিনি কী যে কথা বলবেন, ভেবেই পাচ্ছেন না। মলয়ের চাকবির কথা, বাড়ির কথা, সবই তাঁর জানা হয়ে গেছে।

নিজেরাই বিয়ে ঠিক করেছে, হেমকান্তিরা মেনে নিয়েছেন প্রথম থেকেই। না মানার কোনো কারণ নেই। মলয়ের চেহারা সুন্দর, স্বাস্থ্য ভালো, রেলের চাকরি করে। মলয়ের বাবা-মায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, তাঁরাও বেশ সজ্জন, মোটামুটি অবস্থাপন্ন। সুতরাং পাত্র হিসাবে মলয় আদর্শ। জাতের অমিল আছে। কিন্তু হেমকান্তি ওসব মানেন না।

মলয় তো যে-কোনোদিন বিয়ে করতে রাজি। কিন্তু রিঙ্কির মায়ের ইচ্ছে রেজিস্ট্রি-ফেজিস্ট্রি নয়, একটিমাত্র মেয়ে, তার ঘটা করে বিয়ে দিতে হবে। পুরোপুরি অনুষ্ঠান, শ-চারেক লোক খাওয়ানো। কিন্তু হেমকান্তির বড় শ্যালা অনুপের হঠাৎ ক্যানসার ধরা পড়ল গত মাসে। হেমকান্তির স্ত্রী গায়ত্রী তাঁর এই দাদাকে খুব ভালোবাসে, দাদার এ রকম অসুখের মধ্যে কি বাড়িতে একটা বিয়ে লাগানো যায় ?

অনুপ অবশ্য বেশিদিন ভুগলো না। চলে গেল। আজ তার শ্রাদ্ধ।

মামা মারা গেলে কালাশৌচ হয় না। দু'তিন মাস অপেক্ষা করার পরই বিয়েটা হতে পারবে। সামনের শীতকালেই একেবারে প্রথমের দিকে। হেমকান্তিরা সেই রকম ভাবেই তৈরী হচ্ছেন। ততদিনে নতুন বাড়িটাও পাওয়া যাবে।

মলয় বললো, মেসোমশাই, আপনি শ্রাদ্ধবাড়িতে গেলেন না?

হেমকান্তি বললেন, কাল অনেকক্ষণ ছিলাম। আজ আবার বিকেলের দিকে যাবো। শ্রাদ্ধের ঐ যজ্ঞটজ্ঞ আমার ঠিক সহ্য হয় না!

মলয় বললে, রিঙ্কির জন্য একটা নতুন ক্যাসেট এনেছি। একটু শুনবেন? বাজাবো?

হেমকান্তি বললেন, হ্যা, হ্যাঁ, বাজাও না!

হেমকান্তিদের সি আই টি রোডের পৈতৃক বাড়িটা ভেঙে বড় ফ্ল্যাট বাড়ি উঠছে। নিজের দাদার সঙ্গে শেয়ারে বাড়ি ছিল, বিক্রি করে দেবার পর হাতে কিছু টাকা এসেছে, নতুন বাড়িতে একখানা বড় ফ্ল্যাটও পাবেন। তিনটে বেডরুম, ততদিন এই একটা ছোট্ট ভাড়া বাড়িতে থাকতে হচ্ছে। নীচের তলা, একটা বেডরুম, একটা বসবার ঘর, আর রান্নাঘর, বাথরুম। এই বসবার ঘরেই রাত্তিরে হেমকান্তিকে শুতে হয়। রিঙ্কি থাকে তার মায়ের কাছে। ছেলে চাকরি পেয়েছে দুর্গাপুরে, সে মাঝে মাঝে যখন আসে, তখন আরও অসুবিধে।

বসবার ঘরটাতেই অনেক কিছু ঠাসা।

টু-ইন ওয়ানে ক্যাসেট ভরে চালিয়ে দিলো মলয়। বিরাট একটা ঝনঝন শব্দ হলো। ইংরিজি গান! মাইকেল জ্যাকসান না কি যেন নাম গায়কের। শুনলেই হেমকান্তির পিত্তি জ্বলে যায়। এই সব গানে না আছে সুর, না আছে ছন্দ। শুধু চ্যাঁচামেচি। আথচ রিঙ্কিরা এই সব শুনতেই ভালোবাসে। ওরা রবীন্দ্র-সঙ্গীত, পল্লীগীতির ধারও ধারে না।

এখন এই গান বসে বসে শুনতে হবে? অন্য ঘরে উঠে যাবারও উপায় নেই। গায়ত্রী ফিরে এসে যদি দেখে মলয়কে তিনি একা বসিয়ে রেখেছেন, তাহলে বকুনি দিয়ে মাথা খাবে।

হেমকান্তি হাসি হাসি মুখ করে বসে রইলেন, ভেতরটা তাঁর জ্বলছে! তিনি নিজেই অবশ্য তাঁর মনের মতিগতির ঠিক হদিশ পান না। তাঁর মেয়ে রিঙ্কিকে যে বিয়ে করছে, সে তো বাড়ির ছেলের মতনই হয়ে যাবে। মলয় খুব প্র্যাকটিক্যাল, এর মধ্যে একদিন ফ্রিজটা সারাবার জন্য লোক ডেকে এনেছিল। ভবিষ্যতে ওকে দিয়ে গায়ত্রীর অনেক উপকার হবে। এরা আধুনিক ছেলে মেয়ে। বিয়ের আগে থেকেই যদি পরস্পারের বাড়ি যাতায়াত করে, এক সঙ্গে বেড়াতে বা সিনেমা দেখতে যায়, তাতে আপত্তির কি আছে?

রিঙ্কিও প্রায়ই যায় মলয়দের বড়িতে। মলয় এখানে এসে প্রায়ই সন্ধ্যে কাটায়, দু'একদিন রাত্তিরে খাবারও খেয়ে যায়। কয়েক মাস আগে আর পরে। বিয়ের পরে মলয় তো এ বাড়িতে না হোক, নতুন ফ্ল্যাটে এসে থাকবেও মাঝে মাঝে। বাকি জীবনটার জন্য মলয় তাদের সংসারের সঙ্গে গেঁথে গেল।

হেমকান্তির তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। রিঙ্কির পছন্দের ওপর তিনি কোনোখানে হস্তক্ষেপ করতে চান না। বরং তিনি একটা বিরাট ঝামেলা থেকে বাঁচলেন। মেয়ের বিয়ের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হতো যদি, বারবার পাত্রপক্ষের সামনে মেয়ে দেখানো, তারপর বিয়ের জিনিসপত্র, সোনাদানা নিয়ে দরাদরি, এসব একদম পছন্দ করেন না হেমকান্তি। অথচ করতে বাধ্য হতেন। রিঙ্কি সেই গ্লানি থেকে তাঁকে বাঁচিয়েছে। গায়ত্রীও খুশী, মলয়কে তাঁর খুবই মনে ধরেছে।

এ বাড়িতে যখন মলয় আসে, তখনি গায়ত্রী কেমন যেন বদলে যান। তখন তাঁর এবং হেমকান্তির, এমন কি পরাণেরও একমাত্র কর্তব্য শুধু মলয়কে খুশী করা। রিঙ্কিও এক এক সময় মাকে বকুনি দেয়, মা, তুমি ওকে নিয়ে এতো বাড়াবাড়ি করো কেন? বেশি পাত্তা দিও না তো! অতো জামাই-আদরের যুগ এখন আর নেই!

কোনোদিন একসঙ্গে খেতে বসলে গায়ত্রী হেমকান্তির তুলনায় মলয়কে বড়ো মাছভাজা দেবেনই। মলয়কে তিনি আরও একখানা দেবার জন্য

জোর করবেন, কিন্তু স্বামীর কথা তখন তাঁর মনেই থাকে না। রিঙ্কিই বলে, এ কি, বাবাকে আর একটা দাও।

হেমকান্তি হাত গুটিয়ে বলেন, না, আমি আর খাবো না রে! আমার বেশি খাওয়া ভালো নয়।

সন্ধের দিকে মাঝে মাঝে মদ্যপানের অভ্যেস আছে হেমকান্তির। কখনো দু'একজন বন্ধুও আসে। কোনোদিন এসব ব্যাপার তিনি স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কাছে গোপন করেননি, হবু-জামাইয়ের কাছেও গোপন করার কোনো মানে হয় না।

একদিন হেমকান্তি তাঁর বন্ধু দেবেশের সঙ্গে বসে রাম খেতে খেতে পুরনো আমলের গল্প করছিলেন, এমন সময় এসে পড়লো মলয়।

হেমকান্তি দেবেশের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। নিজেদের গল্প বন্ধ হয়ে গেল, অন্য কথাবার্তা শুরু হলো। দেবেশই একসময় মলয়কে জিজ্ঞেস করলো, তুমি খাও নাকি? নেবে?

মলয় হাসি মুখে তাকিয়ে ছিল হেমকান্তির দিকে।

হেমকান্তি অতিরিক্ত উৎসাহ দেখিয়ে বলেছিলেন, যদি অভ্যেস থাকে তো নাও! এই যে গেলাস! আমি এসব ব্যাপারে কিছু মনে করি না। আমার সামনে তুমি স্বচ্ছন্দে সিগারেটও খেতে পারো। আমাকে অতটা ওল্ড ফ্যাশান্‌ড্‌ মনে করো না।

মলয় দু'তিন পেগ খেল, একটুও বেচাল হলো না, কথাবার্তাতেও বাচালতা প্রকাশ পেল না। এই তো বেশ। এতে আপত্তির কিচ্ছু নেই।

কিন্তু পরে একদিন মলয় নিজেই একটা হুইস্কির পাঁইট কিনে এনে বললো, মেসোমশাই, এটা আপনার জন্য।

সঙ্গে সঙ্গে হেমকান্তির মনটা গুটিয়ে গেল। একেবারেই পছন্দ হলো না তাঁর। হেমকান্তির কোনো বন্ধু সেদিন আসেনি, মলয়ের সঙ্গে বসে বসে ড্রিংক করতে হবে, এই সম্ভাবনাতেই তাঁর পেটটা গুলিয়ে উঠলো। আজকাল তো নাকি অনেক বাবা-ছেলেও এক সঙ্গে খায়। আগেও ছিল,

রাজনারায়ণ বসুর বাবা তাঁর ছেলেকে নিজের হাতে মদ ঢেলে দিতেন। তা হলে জামাইয়ের সঙ্গে বসে খেতেই বা আপত্তি কিসের? আরও অনেক লোক থাকলে তবু চলতে পারে, কিন্তু শুধু জামাইয়ের সঙ্গে বসে মদ্যপানের চিন্তাটাই হেমকান্তির অসহ্য বোধ হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, আজ শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে, আজ আর আমি খাবো না।

এক একদিন মলয় তার দু'একজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে আসে। তারা রিঙ্কিরও বন্ধু। তখন তাদের জন্যে বসবার ঘরটা ছেড়ে দিতে হয়। একালের ছেলেমেয়েদের বাড়ি ফেরার তাড়া থাকে না। এক একদিন তারা রাত দশটা পর্যন্ত আড্ডা মারে। হেমকান্তি পাশের ঘরে চুপচাপ বসে থাকেন।

একদিন তিনি গায়ত্রীকে বলেছিলেন, রিঙ্কিকে ডেকে বলবে নাকি? এবার ওরা আড্ডা বন্ধ করুক। আমি ওঘরে গিয়ে শোবো না? আমার ঘুম পাচ্ছে।

গায়ত্রী চোখ কপালে তুলে ধমকে বলেছিলেন, তুমি কি আক্কেলের মাথা খেয়েছো নাকি! মলয়দের চলে যেতে বলবে? ওরা গান-বাজনা শুনছে। এমন কিছু দেরি হয়নি। একদিন একটু জেগে থাকতে পারো না? তোমার আবার বেশি বেশি ঘুম!

আগে ইলিশ মাছের পেটির মধ্যেই ডিমগুলো থাকতো। এখন সবটা ডিম বার করে নিয়ে ভাজা হয়। মলয় ইলিশের ডিমভাজা খেতে খুব ভালোবাসে। ঝোলের মাছের ফাঁকা পেটির মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে হেমকান্তি ঘোরাতে থাকেন। তিনি যে ঝোলের মাছেরই ডিম পছন্দ করতেন, তা গায়ত্রী ভুলে গেছে।

মলয়ের এক দিদি-জামাইবাবু থাকে সুইডেনে, তারা বেড়াতে এসেছে কলকাতায়। জামাইবাবুর অফিসের কিছু একটা কাজও আছে দিল্লীতে। এখন কলকাতায় এসে গেল, শীতকালে আবার মলয়-রিঙ্কির বিয়েতে

আসতে পারবে না। ওরা একদিন রিঙ্কিকে খাওয়াতে নিয়ে গেল পার্ক-স্ট্রীটে।

সে রাতে ফিরে এসে রিঙ্কি বললো, মা, মলয়ের দিদি কী চমৎকার মানুষ তুমি ভাবতে পারবে না। আর ওর জামাইবাবুও দারুণ ভালো। ওরা একদিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। মলয় তোমার এত প্রশংসা করেছে দিদি-জামাইবাবুর কাছে—

গায়ত্রী বললো, ঠিক আছে, ওদের একদিন আসতে বল।

শুধু আসতে বললেই তো হয় না, নেমন্তন্ন করতে হয়। বিয়ের সময় ওরা থাকবে না, সুতরাং ভালো করে খাওয়ানো উচিত।

হেমকান্তি এলাহি বাজার করে আনলেন।

দিদি-জামাইবাবু, তাদের দুটি ছেলে মেয়ে, সেই সঙ্গে মলয়ের ছোট বোনকেও বাদ দেওয়া যায় না। এইটুকু ফ্ল্যাটে এত লোকের জায়গা হওয়াই মুশকিল। মলয় অবশ্য দিদিকে অনেকবার জানিয়েছে যে রিঙ্কিরা শীগগিরই সি আই টি রোডের নিজস্ব বড় ফ্ল্যাটে উঠে যাবে।

বসবার ঘরে জামাইবাবু, রিঙ্কি, মলয়, আর দিদির ছেলে মেয়ে দু'জন। শোবার ঘরে মলয়ের দিদি আর ছোট বোন। মলয়ের দিদি সত্যি এক মিনিটে মানুষকে আপন করে নিতে পারে। বিদেশে থাক বলে কোনো অহঙ্কার নেই। গায়ত্রীর সঙ্গে তার কত গল্প।

হেমকান্তি কিছুক্ষণ বসলেন বসবার ঘরে। প্রথম দিকে সবাই তাঁকে খুব খাতির করলো। তারপর তারা এমন পারিবারিক গল্পে মেতে উঠলো যে হেমকান্তি তাতে যোগ দিতে কোনো উৎসাহ বোধ করলেন না। তাঁর হাই উঠতে লাগলো। রিঙ্কি আর দু'দিন পরেই ও বাড়ির বউ হয়ে যাবে, সুতরাং মলয়দের বাড়ির একটা পোষা কুকুর কিংবা পুরনো রান্নার লোক সম্পর্কে চুটকি শুনতে তার আগ্রহ হতে পারে, কিন্তু হেমকান্তি এসব কতক্ষণ ধরে শুনবেন?

তিনি উঠে এলেন পাশের ঘরে।

গায়ত্রী কি যেন একটা কথা নিয়ে খুব হাসাহাসি করছে অন্য দুই নারীর

সঙ্গে। মলয়ের দিদি হেমকান্তিকে দেখে সম্ভ্রমের সঙ্গে বললেন, বসুন, মেসোমশাই বসুন।

গায়ত্রী বললেন, তুমি আবার এখানে এলে কেন? মেয়েদের কথা তুমি কি শুনবে? অন্য জায়গায় যাও না।

আর অন্য জায়গা কোথায়?

বাথরুমের কাছে চিলতে বারান্দা। হেমকান্তি সেখানে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর মুখে একবার রাগ, একবার বিষণ্নতা ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

এতদিন ছিলেন তিনি এই পরিবারের প্রধান ব্যক্তি। একমাত্র পুরুষ। তাঁর ইচ্ছে-অনিচ্ছের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করতো, তাঁর ভালো-লাগা, মন্দ-লাগার মূল্য দিত অন্যরা। এখন থেকে মলয় সেই জায়গা নিয়ে নেবে। গায়ত্রীর কাছেও তাঁর আর মূল্য নেই।

মাত্র একষট্টি বছর বয়েস হয়েছে হেমকান্তির। শরীরে কোনো স্থায়ী রোগ নেই। গায়ে জোর আছে যথেষ্ট। তবু অন্য একজন ছোকরা এসে তাঁকে বুড়োদের দলে, বাতিলের দলে ফেলে দিচ্ছে। তিনি এখন আর হেমকান্তি নামে একটি ব্যক্তিত্ব নন, তিনি রিঙ্কির বাবা!

বুনো পশুদের মধ্যে একজন থাকে যূথপতি। তাকেই সবাই মানে। সে বুড়ো হয়ে গেলে অন্য একটা জোয়ান পশুর সঙ্গে তার লড়াই হয়, একদিন, জোয়ানটা জিতে গেলে সে-ই দলপতির জায়গা নেয়, বুড়োটা দল ছেড়ে চলে যায়। মানুষের সমাজেও যে অনেকটা সে রকমই, তা এতদিন খেয়াল করেন নি হেমকান্তি। মলয় তাঁর জায়গা কেড়ে নিতে এসেছে।

কিন্তু লড়াই তো হলো না। হেমকান্তির গায়ে এখনো যথেষ্ট শক্তি আছে ইচ্ছে করলে তিনিও আধ বোতল মদ উড়িয়ে দিতে পারেন, অন্য মেয়ের সঙ্গে প্রেমও করতে পারেন। মলয়কে তিনি এত সহজে জায়গা ছেড়ে দেবেন কেন?

পরের মুহূর্তেই হেমকান্তির লজ্জা হলো। মলয় তাঁর অতি আদরের অতি স্নেহের মেয়ে রিঙ্কির স্বামী হতে যাচ্ছে। তার সঙ্গে লড়াইয়ের প্রশ্ন আসে

কী করে? তিনি কি এত স্বার্থপর হতে পারেন? রিঙ্কির যাতে ভালো হয়, সে যাতে জীবনে সুখী হয়, তা তিনি চাইবেন না।

মানুষের সমাজেও লড়াই হয়, কিন্তু বাইরে থেকে বোঝা যায় না। মলয়ের সঙ্গে তাঁর লড়াই চলছিল অনেক দিন ধরেই, হেমকান্তি কখন যে হেরে বসে আছেন, তা তিনি টেরও পাননি।

তিনি বুক খালি করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।



আকাশচুম্বী

সন্ধের পর থেকেই একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে, ও এমন কিছু না। লোড-শেডিং হয়ে আছে অনেকক্ষণ ধরে, তাতেই বা কী আসে যায়! কলকাতার রাস্তার সঙ্গে এখন গ্রামের রাস্তার কোনো তফাৎ নেই। ওদের ছু'জনের হাঁটতে একটুও অসুবিধে হয় না।

গড়িয়াহাটের মোড় পেরিয়ে ওরা এগিয়ে গেল গোল পার্কের দিকে। চতুর্দিকে এত মানুষের ভিড়, তার মধ্যে ওরা আলাদা। ওরা নিজেদের নিয়েই মশগুল।

মেয়েটি পরে আছে একটা ফুলছাপ শাড়ি। ওর নাম মুন্নি।

ছেলেটি মালকোঁচা মারা ধুতির ওপর পরেছে একটা নীল হাফশার্ট। ওর নাম জাত্নু।

ছু'জনেরই তেজী চামড়া, শরীরের কোথাও এক ছিটে চর্বি নেই, কোথাও কোথাও একটু আধটু ধুলো বালি লেগে আছে অবশ্য।

মুন্নি বললো, আজ রাতে ভাত খাবো।

জাত্নু বললো, রুটি খাবি না? ও দোকানে তো ভাত পাওয়া যায় না।

মুন্নি তবু আত্নুরে গলায় বললো, অন্য দোকানে খাবো। আজ রুটি খেতে ইচ্ছে করছে না।

তারপর ফিক করে হেসে বললো, আজ আমি খাবারের পয়সা দেবো!

সাদার্ন এভিনিউয়ের ওপর লেকের এক কোণে পর পর কয়েকটা দোকা-

নের মাঝখানে একটা হোটেল। ওখানেই রোজ সন্ধেবেলা ওরা খেতে আসে। রুটি, ডাল-তরকা, সবজি, ডিমের ঝোল, কিমা, কারি। গরম গরম সেঁকে দেয় রুটি, পেঁয়াজ লঙ্কা যত ইচ্ছে চাও দেবে।

রাস্তার উল্টো দিকেই একটা চীনে রেস্তোরাঁ। সেখানের চেয়ে এই হোটেলের ভিড় অনেক বেশি।

আজ মুন্নি আর জাহ্নু সেদিকে গেল না।

ওরা ঢাকুরিয়া ব্রিজ পার হয়ে বাস ডিপোর পেছনটায় আর-একটা হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ালো। অন্ধকারের মধ্যে এখানে জ্বলছে একটা হ্যাজাক বাতি। কয়েকখানা বেঞ্চি পাতা। পেঁয়াজ-মেশানো মুসুরির ডালের গন্ধে ম ম করছে বাতাস।

মুন্নি আর জাহ্নু ভেতরে ঢুকতে দ্বিধা করছে খানিকটা, একটা বাচ্চা বেয়ারা বললো, আসুন, বসুন, এই তো জায়গা আছে!

ওরা দু জনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো। কোনো কারণ নেই, এমনিই!

ভাত, ডাল আর ঢ্যাড়সের তরকারি নিল প্রথমে। সেই খাওয়া শেষ হতে না হতেই বাচ্চা বেয়ারাটা কানের কাছে চেঁচাতে লাগলো, আর কী নেবেন। পার্শে মাছ, ট্যাংরা মাছ, মট্ন কারি, ফাউল কারি···

মুন্নি বললো, আজ মাংস খাবো!

জাহ্নুর তাতে কোনো আপত্তি নেই। আজ দু' জনের কাছেও অনেক টাকা।

এক প্লেট মাংসের সঙ্গে দু বার ঝোল চেয়ে নিয়ে আরও অনেকটা ভাত। শহুরে সরু চালের ভাত, ঠিক যেন পেট ভরতেই চায় না।

হোটেল থেকে মুন্নি আবার আবদার জানালো, পান খাবো!

জাহ্নু পানের দোকানে গিয়ে চার খিলি পান নিয়ে ফেললো। মিঠা পাতা, সুপারি, জর্দা, ইলাইচ। পাঁচ টাকার নোট বাড়িয়ে দিতেও দ্বিধা করলো না সে।

তারপর উদ্দেশ্যহীন রাস্তায় ঘুরলো অনেকক্ষণ।

এক সময় বৃষ্টি বেশ ঝেঁপে এলো, ওরা দাঁড়ালো একটা গাড়ি বারান্দার তলায়। এবার বাড়ি ফিরতে হবে।

শহরের রাস্তায় ছাতা না থাকলেও চলে। বারান্দার পর বারান্দা, আর দোকানের ঝাঁপের তলা দিয়ে এগিয়ে যাওয়া যায়।

বাড়ি। প্রকাণ্ড বাড়ি।

একতলায় অনেকে শুয়ে আছে ঘেঁষাঘেঁষি করে, কুণ্ডলি পাকিয়ে। বৃষ্টির আমেজে ঘুমিয়ে পড়েছে এর মধ্যে।

ওরা সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল দোতলায়।

মুন্নি বললো, আরও ওপরে চল!

একেবারে ধপধপে নতুন বাড়ি। গতকালই দেয়ালগুলোতে সাদা রঙের পোঁচ পড়েছে, চুন আর এলা'র গন্ধ। জানালার গ্রিলে রং। হাত দিলে এখনো লেগে যেতে পারে।

দরজা লাগানো হচ্ছে আজ থেকে। এখনো সব ঘর বন্ধ হয়নি।

মুন্নি বললো, আরও ওপরে যাবো।

জাহ্নু বললে, আরও উপরে গিয়ে কী হবে? এখানেই থেকে যাবি!

মুন্নি সুর করে বললো, না, না, আরও আরও ওপরে যাবো!

জাহ্নু মুন্নির কাঁধে হাত দিয়ে বললো, ইস একেবারে ভিজে গেছিস যে রে!

মুন্নি খিলখিল করে হেসে বললো, তুই বুঝি ভিজিস নি!

জাহ্নু নিজের জামাটা খুলে ফেললো। মুন্নির দিকে তাকালো। মুন্নি তো এভাবে শাড়ি খুলে ফেলতে পারে না। সে পরে শাড়ি বদলাবে। এখন তার ওপরে ওঠার নেশা লেগেছে।

ছ' তলার ওপরে উঠে এসে জাহ্নু বললো, ঠকে গেছি। আর উঠতে হবে না। এই ঘরটা কী ভালো দ্যাখ! সব দিকে জানালা।

ঘরটায় ঢুকে পরিদর্শন করে দেখলো মুন্নি। অন্ধকার বটে। কিন্তু দেয়ালের নতুন সাদা রং থেকে যেন কিছুটা আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

সঙ্গে একটা মস্ত বারান্দা।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে বেশ মজা লাগলো মুন্নির। একটা নারকোল গাছের

মাথা অনেক নিচে। গ্রামে থাকার সময় মুন্নি দেখেছে, নারকোল গাছের মাথা সব সময় বাড়ি ছাড়িয়ে যায়। এখানে নারকোল গাছটা পাল্লায় হেরে গেছে।

চিক করে একটু থুতু ফেললো মুন্নি। কোথায় হারিয়ে গেল সেই থুতু। তারপর সে বললো, চল, ওপরে চল!

জাদু বললো, আবার? এই ঘরটা তোর পছন্দ হলো না?

মুন্নি হেসে হেসে মাথা দোলাতে লাগলো। কত ঘর, একশো, দুশো, এর মধ্যে যে কোনো ঘরেই ইচ্ছে করলে ওরা থাকতে পারে। রাজা বাদশা-দেরও এতো ঘর থাকে না।

সে বললো, চল না। চল না!

সাত তলা, আট তলা, ন' তলা···। দশ তলায় এসে মুন্নির পা ব্যথা হয়ে গেছে। সিঁড়ির রেলিং ধরে সে দম নিচ্ছে।

জাদু এখানেও থামবে না। ওপরেই যখন উঠছে, তখন একেবারে ওপরে উঠে যাবে না কেন?

সে মুন্নির হাত ধরে টেনে বললো, আয়!

মুন্নি বললো, দাঁড়া, দাঁড়া, একটু শ্বাস নিই!

টপ করে জাদু পাঁজাকোলা করে তুলে নিল মুন্নিকে।

মুন্নি হাত-পা ছুঁড়ে বলতে লাগলো, আরে আরে, ছাড়, ছাড়, পড়ে যাবো। তুইও তো থকে গেছিস!

কে শোনে কার কথা। মুন্নিকে কোলে নিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো জাদু।

ওপরে এসে একটা গোটানো মাদুরের মতন মুন্নিকে দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলো সে।

জাদুও খুব হাঁপিয়ে গেছে। বুকটা উঠছে আর নামছে তার।

এগারো তলা। এটাই সবচেয়ে উঁচু। সারা বাড়িতে আলো নেই, কিন্তু এখানে আকাশের আলো আছে। ভিজে শাড়িতে মুন্নির হিলহিলে শরীরটা স্পষ্ট।

জাদু বললো, এখানে থাকবো। সকলের মাথার ওপরে। কোন্ ঘরটায় শুবি বেছে নে।

পর পর অনেকগুলো ঘর। যে-কোনো ঘর ওদের শয়নকক্ষ হতে পারে। মুন্নি আগেই একটা বেছে রেখেছে মনে মনে। দক্ষিণ দিকের কোণের ঘর।

তিন দিক খোলা এই ঘর। এখান থেকে গোটা শহরটাকেই পায়ের তলায় মনে হয়। দূরের দিগন্তকে মনে হয় সমুদ্র।

জাদু দেয়ালে হাত বোলাতে লাগলো খুব মায়ার সঙ্গে। মুন্নি মাথায় করে ইট বয়ে এনেছে, সে সিমেন্ট গেঁথেছে। কত মসৃণ হয়েছে দেয়াল। এ ঘর তার সৃষ্টি। তাদের দু' জনের।

কাল থেকে সব ঘরে দরজা বসে যাবে। দরজার সঙ্গে তালা। তখন সব ঘর বন্ধ হয়ে যাবে।

কাল থেকে ইলেকট্রিক মিস্তিরি, কলের মিস্তিরিরা কাজ করবে। জাদু মুন্নিদের কাজ শেষ। ওরা চলে যাবে।

আজ রাত পর্যন্ত এই সব ঘরের ওপর ওদের অধিকার আছে। এই শহরের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ঘরখানিতে ওরা শুয়ে থাকবে পাশাপাশি। ওদের নিজের হাতে গড়া ঘর। না ঘুমিয়ে ওরা জেগে জেগে গল্প করবে সারা-রাত।

দু'জনেই দেওয়ালে হাত বুলোচ্ছে তারিফ করছে মসৃণতার।

জাদু জিজ্ঞেস করলো, ভিজে শাড়িটা খুলবি না? এখানে তো আর কেউ নেই। শরমের কী আছে?

মুন্নি ভ্রুভঙ্গি করে বললো, না। খুলবো না!

দু'জনে গিয়ে দাঁড়ালো বারান্দায়। বাবু-বিবিদের মতন পরস্পরের গলা জড়িয়ে ধরলো। গালে ঠেকালো গাল।

মুন্নি হাসতে হাসতে বললো, আমাদের বাড়ি!

জাদু মুন্নিকে আরও জোরে টেনে বললো, আমাদের বাড়ি!

তারপর দু' জনেই হাসতে লাগলো পাগলাটে গলায়।

একটু পরে রেলিং-এ অনেকখানি ঝুঁকে মুন্নি তার জিভটা বার করলো। নিচের দিকে অন্ধকারে ঘুমিয়ে আছে শহর। মুন্নি দেখছে ওপরের দিকে।

জাহ্নু জিজ্ঞেস করলো, ও কী করছিস?

মুন্নি বললো, ছ্যাখ ছ্যাখ, আকাশ কত কাছে। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে না?

জাহ্নু হাত তুলে বললো, কই, ছোয়া যাচ্ছে না!

মুন্নি বললো, দূর বোকা, তুই কিছু বুঝিস না। ছ্যাখ না, মেঘ নিচু হয়ে আসছে। বৃষ্টি নামবে। একটু মেঘ খেয়ে ছ্যাখ না। জিভে লাগছে!

জাহ্নুও জিভ বার করে দিলো।

তারপর দু'জনে মহা উল্লাসে মেঘ খেতে লাগলো।



লোভী

ভিক্ষে কর কেন ? জোয়ানমদ্দ, গায়ে খেটে খেতে পার না ?

এই কথা বলে বাবা বিপদে পড়ে গেলেন। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে বললো, বাবু, একটা কাজ দিতে পারেন ? কাজ গ্যান, ভিক্ষা করবো না।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী কাজ পার ? রান্না জানো ?

লোকটি বললো, আইজ্ঞা না। রান্না করি নাই কখনো।

বাবা আবার বললেন, তাহলে তুমি কী কাজ জানো ? লোকে যে তোমাকে চাকরি দেবে, কী দেখে দেবে ?

লোকটি বললো, চাষের কাজ জানি। জমিতে হাল দিতে পারি। নিড়ুনির কাজ পারি। গাই-বলদ চরাতেও পারি। দেবেন বাবু, কাজ ? একবার দিয়ে গ্যাখেন।

কলকাতা শহরে এসে লোকটা চাষের কাজ চাইছে। চাষের জমি দূরে থাক, সারা পৃথিবীতে আমাদের এক টুকরো ভূমিও নেই। আমরা ভাড়া বাড়িতে থাকি। কলকাতায় কারই বা গোয়াল ঘর আছে।

বাবা ধমক দিয়ে বললেন, চাষের কাজ জানো তো গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় ভিক্ষে করতে এসেছ কেন ? তোমার জমি নেই ?

লোকটি দু'দিকে মাথা নেড়ে বললো, আমার ছিল না। আমার বাপেরও ছিল না।

আমরা না হয় রিফিউজিদের বংশ, তাই আমাদের মাটি নেই। কিন্তু

পশ্চিমবাংলাতেও লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন চাষী। এবং কেন তারা গ্রাম ছেড়ে এক এক সময় শহরে ভিক্ষে করতে আসে, তা জিজ্ঞেস করাই বাহুল্য-মাত্র। এ শহর এমন কত পরগাছাকে আশ্রয় দেয়।

লোকটি আমাদের দরজার সামনে বসে পড়ে বললো, বাবু, আপনি বল-লেন, তাই আমি আর ভিক্ষে করবো না। ভিক্ষা করা খারাপ। আপনি আমাকে যে-কোনো একটা কাজ দেন।

মুখে কথা ফিরিয়ে নেওয়া বাবার স্বভাব নয়। তিনি কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন লোকটির দিকে। তারপর বললেন, উঠে এসো! এখন কিছুদিন এখানেই থাকো। তারপর তোমাকে মাটি কাটার কাজ দেবো। তোমার নাম কী?

হারাধন।

ভেতরের দিকে তাকিয়ে বাবা হাঁক দিয়ে বললেন, এই মিনু তোর মাকে ডাক তো! এই হারাধন এখন থেকে বাড়ির কাজ করবে। আগে ওকে দুটি খেতে দে!

বাবা জেদী পুরুষ। আমাদের পরিবারের হিটলার। বাবার মুখের কথার প্রতিবাদ করার ক্ষমতা কারুর নেই। মা অনেক সময় ঝগড়া ও কান্না-কাটি করেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাবার জেদটাই বজায় থাকে। আমাদের ভাই-বোনেদের মতামতের তো কোনো মূল্যই নেই। বাঙাল পরিবারের এটাই রীতি। আমি তখন বি. এস. সি. পাশ করে প্রায় বেকার, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে প্রায়ই ভিক্ষে করি, বাবা তা জানতে পারেন না।

বাবার কাণ্ডজ্ঞান সত্যিই কম। আমাদের মাত্র ছোট ছোট তিনখানা ঘর, আমরা চার ভাই-বোন, ছোট কাকাও আমাদের সঙ্গে থাকে, এর মধ্যে একটা বয়স্ক বাইরের লোককে কোথায় জায়গা দেওয়া হবে? একটা বারান্দা পর্যন্ত নেই।

হারাধনের বেশ চওড়া শরীর, লম্বাও কম নয়, মুখে রুখু দাড়ি, বয়েস হবে বছর পঁয়তাল্লিশেক। কানা-খোঁড়া কিছু নয়, এরকম একটা পুরুষকে ভিক্ষে

করতে দেখলে রাগ হবারই কথা। তা বলে কি ওকে আমাদের বাড়িতেই রাখতে হবে?

বাবার বন্ধু গৌতমকাকা একজন মাটি-কাটা কনট্রাক্টর। যে সব জায়গায় রাস্তা বা ব্রীজ বানানো হয়, সেখানে তিনি আড়াইশো-তিনশো মজুর খাটান। গৌতমকাকাকে বলে সেই কাজেই হারাধনকে ভিড়িয়ে দেবেন, বাবা এরকম ভেবে রেখেছিলেন। গৌতমকাকা আপাতত মালদায় একটা খাল কাটাচ্ছে। মাস তিনেক আমাদের বাড়িতে আসেননি।

মুড়ির সঙ্গে বাদাম আর পেঁয়াজকুচি মিশিয়ে মাখা আর চা, এই আমাদের সকালের জল খাবার। হারাধনকেও সেই মুড়ি মাখা দেওয়া হলো এক বাটি। বাথরুমে যাবার সরু প্যাসেজটায় উবু হয়ে বসে সে মুড়ি থেকে খোসা ছাড়ানো বাদাম কয়েকটা বেছে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এগুলো কী?

আমি বললুম, তুমি বাদাম চেনো না?

সে বিহ্বল ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। আপন মনে বললো, বাদাম! বাদাম!

তারপর কয়েকটা মুখে দিয়ে এমন আস্তে আস্তে চিবুতে লাগলো, যেন বাদাম একটা বিস্ময়কর বস্তু। লোকটা আগে কখনো বাদাম খায়নি নাকি?

আমার ছোড়দি ওকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার আর কে আছে? বউ, ছেলে-মেয়ে নেই? তারা কোথায়?

হারাধন বললো, আমার আর কেউ নাই।

হঠাৎ ঝপাঝপ বাদাম-মুড়ি সব শেষ করে ফেলে সে লোভীর মতন বললো, আর একটু দেবেন? বড় ভালো! বড় ভালো!

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে মা বললেন, প্রথম দিনেই এত! এখানে ওসব আব্দার চলবে না! যা দেওয়া হবে, তাই খাবে!

হারাধন মায়ের পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললো, মা জননী, এই চরণে স্থান দিয়েছেন, কোনোদিন নেমকহারামী করবো না, আপনি বললে

নিজের গলাটাও কেটে ফেলতে পারি !

মা আঁতকে উঠে সরে যাবার চেষ্টা করলেন। আমি বললুম, কী হে, তুমি কি গ্রামে যাত্রা-টাত্রা করতে নাকি ?

সে মুখ তুলে এক গাল হেসে বললো, আইজ্ঞে ! তিনখানা পালায় অ্যাক্‌টো করিছি !

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল, হারাধনের মাথায় বেশ গোলমাল আছে !

সে বেশি কথা বলে। রান্নাঘরের দরজায় বসে সে মায়ের সঙ্গে অনবরত বকবক করতে লাগলো। তাব গ্রামের গল্প। বনগাঁ সীমান্তের কাছে সর-দার পাড়ায় তার বাড়ি। দু'পুরুষ আগেও তারা বিহারের লোক ছিল। তার বউ এবং তিনটে ছেলে-মেয়ে ছিল এক সময়। বউ আর এক মেয়ে মারা গেছে, ছেলেদুটো অন্যের বাড়িতে থাকে।

মাথার দোষ আছে বলেই সে কোনো কথা গোপন করতে পারে না। বিকেলের মধ্যেই জানা গেল যে ডাকাতির দায়ে সে দু'বছর জেলও খেটেছে।

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো যে, একটা মুস্কো মতন জোয়ান, যার মাথার গণ্ডগোল আছে, সে আবার ডাকাতও বটে, এরকম একজনকে রাখতে হবে আমাদের বাড়িতে ! মা তখনই ভয় পেয়ে শোওয়ার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

বাবা অবশ্য এতেও দমে যাবার পাত্র নন, স্বদেশী আমলে তিনি কিছুদিন জেল খেটেছিলেন, এখন জীবিকার তাড়নায় সদা ব্যস্ত হলেও মনের মধ্যে দেশ-দশের জন্য কিছুটা খচখচানি রয়ে গেছে।

বাবা বললেন, যে-লোক নিজের থেকেই ডাকাতির কথা স্বীকার করে, তার মতো লোক খারাপ হতে পারে না। অত ভয় পাবার কী আছে ?

এই ব্যাপারে অবশ্য আমি বাবার সঙ্গে এক মত। তাঁর ঐ যুক্তির জন্য নয়, লোকটিকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। কথাবার্তার মধ্যে পাগলাটে সুরটা বেশ মজার। বাড়িতে আমরা তিনজন পুরুষ মানুষ, ওকে ভয় পাব

কেন ?

ওকে দিয়ে আধ-মণ কয়লা ভাঙানো হলো ! একতলা থেকে বালতি করে জল টেনে টেনে পুরো ছাদটা ধোওয়ানো হলো। তাতে ওর কোনো আপত্তি নেই।

সারাদিন হারাধন এখানে সেখানে কাটায়, কাজ না থাকলে সদর দরজার বাইরে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। রাত্তিরে ওর শোবার ব্যবস্থা করা হয়েছে আমাদের ঘরে।

একঘরে বাবা-মা, এক ঘরে বোনেরা, আর কোথাও তো ওর জন্য জায়গা করা যাবে না। বসবার ঘরটাতেই হু'খানা খাটে কাকা আর আমি শুই। তারই এক পাশে হারাধনের জন্য একটা মাহুর আর বালিশ পাতা হলো। হারাধনের সঙ্গে তো বিছানা টিছানা কিছুই ছিল না। ও আগে শ্রীমানী মার্কেটের গাড়ি বারান্দার তলায় শুয়ে থাকতো।

খাওয়া দাওয়ার পর ছোটকাকার সঙ্গে এটা আমার আড্ডার সময়। ঘরের মধ্যে একটা উটকো লোক ঢোকাবার জন্য ছোটকাকা খুবই রেগে গেলেও কিছুই তো করার নেই। ছোটকাকার সামান্য হুটো টিউশানির রোজগার। হিটলারের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু বলার সাহস নেই ছোট-কাকার।

ছোটকাকা চুরুট খায়, একটা লম্বা চুরুট শেষ করা পর্যন্ত আমাদের গল্প চলে।

হারাধন তার মাহুরের ওপর বসে চোখ বুঁজে বিড়বিড় করে কী যেন জপ করতে লাগলো। তার গলায় একটা মোটা রুদ্রাক্ষের মালা আগেই দেখেছি। সেটা তার ভিক্ষে করার ভেক মনে হয়েছিল। কিন্তু তার সত্যিই ভক্তি ভাব আছে দেখা যাচ্ছে।

চুরুট ধরিয়ে ছোটকাকা বললো, এই, তুই কী রকম ডাকাতি করেছিলি রে ? মানুষ মেরেছিলি ?

চোখ বোঁজা অবস্থাতেই জিভ কেটে সে বললো, আইজ্ঞে না বাবু, সে রকম অধর্ম করি নাই। সিন্ধুক ভেঙেছি আর ধানের গোলা লুটেছি।

ছোটকাকা বললো, এগুলো বুঝি ধর্মের কাজ। একেবারে ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির। শোন, এ বাড়ির বড়বাবু দয়া করে তোকে রেখেছেন। কোনো রকম চুরি-ডাকাতির মতলব যদি করিস, তা হলে মাথা ভেঙে গুঁড়ো করে দেবো।

হারাধন বললো, বড়বাবু তো আমারে মাটি-কাটার কাজ দেবেন বলেছেন। সেই কাজ আমি ভালো পারবো।

ছোটকাকা আবার জিজ্ঞেস করলে, ডাকাতি করে কত টাকা পেয়েছিলি। এক গাল হেসে হারাধন বললো, কিছুই পাই নাই বাবু, ধরা পড়ে গেলাম যে।

হারাধন লম্বা করে গল্পটা বলার চেষ্টা করছিল, তাকে মাঝে মাঝে থামিয়ে দিয়ে আমরা যে কাহিনীটা উদ্ধার করলুম, তাতে বোঝা গেল, ডাকাত হিসেবেও সে একটা অপদার্থ। খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরেই সে একটা ডাকাতদের দলে ভিড়েছিল। প্রথমবারেই বনগাঁর এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দিয়ে সে ধরা পড়ে যায়। পালাবার সময় একখানা রামদা ঘুরিয়ে গ্রামের লোকদের ভয় দেখানোই ছিল তার কাজ। হঠাৎ তার হাত থেকে রামদাটা খসে ছিটকে পড়ে গেল দূরে। সেটা সে কুড়োতে যেতেই তিন চারজন লোক ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর।

এমনই অদ্ভুত হাসি হাসি মুখ লাগিয়ে রেখে হারাধন গল্পটা বলে যায় যেন এটা তার জীবনের একটা দারুণ মজার অভিজ্ঞতা।

ধরা পড়ার পর সে প্রচণ্ড মার খেয়েছিল। তারপর পুলিশের হাতে যায়। জেল থেকে গ্রামে ফেরার পর তার পুরোনো স্যাঙাতরাও তার ভুলের জন্য তাকে বেধড়ক পিটিয়েছিল। একজনের শাবলের কোপে তার পায়ের দুটো আঙুল উড়ে যায়।

বাঁ পা তুলে সে তার পুরোনো ক্ষতস্থানটা দেখাবার চেষ্টা করতেই ছোট কাকা বললো, থাক থাক।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, তুমি ঐ একবারই ডাকাতি করেছ? তার আগে চুরি টুরি করনি দু' একবার?

হারাধন বললো, খেজুর রস চুরি করিছি অল্প বয়েসে। তারপর ধরেন

কখনো খিদের জ্বালায় লোকের বাড়ি থেকে কলাটা-মুলোটা নিয়েছি, কিন্তু টাকা-পয়সা—

কথা বলতে বলতে থেমে গিয়ে সে ছোট কাকার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলো। তারপব বললো, ওটা কী?

ছোটকাকা বললে. এটা চুরুট। তুই কখনো চুরুট দেখিসনি?

দুদিকে মাথা নেড়ে সে বললে, আইজ্ঞে না।

তারপর চিন্তিত ভাবে প্যাঁচার মতন দু'একবার চোখ পাল্টে বললো, হ্যাঁ, দেখিছি বোধহয় একবার। জেলখানার এক বাবুর মুখে। ওডা কেমন লাগে? হুঁকোর মতন!

লোকটা খোসা ছাড়ানো সাদা চীনা বাদাম দেখেনি। চুরুট দেখলে অবাক হয়, এ কেমন ধরনের গেঁইয়া? এমন গ্রামও আছে এখনো? হুঁকোর মতন শুনে আমার হাসি পেয়ে গেল।

ছোটকাকা জিজ্ঞেস করলো, তুই গাঁজা খেয়েছিস কখনো?

সে উত্তর না দিয়ে বললো, বাবু, আমারে একখানা দেবেন? একবার টেনে দ্যাখব? জীবনটা ব্রেথা যাবে! দ্যান না!

ছোটকাকা আর আমি স্তম্ভিত হয়ে চোখাচোখি করলুম।

বাড়ির একটা চাকর, তাও সদ্য নতুন, বাড়ির বাবুদের কাছে সিগারেট কিংবা চুরুট চাইছে, এ কখনো কেউ শুনেছে?

ছোটকাকা তো বাবারই ছোট ভাই, সেও কম রাগী নয়। সে হুংকার দিয়ে বললো, একটা লাথি মেরে মুখ ভেঙে দেবো। বেশি বেশি আবদার পেয়েছিস তাই না?

হারাধন হি হি করে হেসে বললো, মারেন, মারেন, যত জোরে ইচ্ছা মারেন। লাথি আমি অনেক খাইছি, তাতে আমার বেশি লাগে না। কিন্তু ঐ লম্বা তামুক কখনো খাই নাই। জীবনে একবার খাইয়া দ্যাখব না। দ্যান ছোটবাবু, একবার দ্যান।

পাগল না হলে কেউ এই ভাবে চাইতে পারে না।

এমন ভাবে চাইলে না-ও বলা যায় না।

গলায় ধোঁয়া আটকে ছোটকাকা একবার বিষম খেলো। তারপর তিন-চতুর্থাংশ শেষ হয়ে আসা চুরুটটা সে ছুঁড়ে দিলো হারাধনের দিকে। বাবুদের সামনে যে ধূমপান করতে নেই, সে জ্ঞানটুকু আছে হারাধনের! চুরুটের টুকরোটা কুড়িয়ে নিয়ে একটা ধাড়ী হনুমানের মতন লাফাতে লাফাতে চলে গেল বাইরে।

একটু বাদে ফিরে এসে সে ঢিপ করে প্রণাম করলো ছোটকাকার পা ছুঁয়ে।

প্রায় লাথি মারার ভঙ্গিতেই বিরক্ত হয়ে পা সরিয়ে নিল ছোট কাকা। পরবর্তী তিনচারদিন হারাধনকে নিয়ে বেশ হৈ হৈ করেই কাটলো। প্রায়ই তাকে নিয়ে মজা করা যায়। আমরা গ্রামে বিশেষ থাকিনি, হারাধনের কাছ থেকে আমরা গ্রামের সব অদ্ভুত গল্প শুনি। অবশ্য গ্রামের সব লোকই নিশ্চয়ই হারাধনের মতন অজ্ঞ হয় না।

বাবা একদিন গোটা চারেক মাগুর মাছ আনলেন বাজার থেকে। তার মধ্যে একটা দুরন্ত মাগুর হঠাৎ বাজারের থলে থেকে লাফিয়ে পড়লো উঠোনে। কাঁটার ভয়ে কেউ সেটাকে ধরতে সাহস পাচ্ছে না। মা বললেন, ও হারাধন, মাছটা তুলে আন।

মাছ ধরবে কি হারাধন ড্যাবড্যাবে চোখে হাঁ করে তাকিয়ে আছে সেটার দিকে। ফিসফিস করে বললো, এত বড় মাগুর? জন্মে দেখি নাই।

কথাটা আমাদের খুব বাড়াবাড়ি মনে হলো। মাগুরটা পেল্লায় কিছু না, বাজারে এই রকম মাগুরই তো বিক্রি হয়, এক বিঘতের চেয়ে একটু লম্বা। গ্রামের লোক একটা এরকম মাগুর দেখেনি?

বাবা বললেন, কলকাতার বাজারে বেশির ভাগই চালানি মাগুর আসে, ওয়েস্ট বেঙ্গলের গ্রামে বেশি বড় মাগুর হয় না। ছোট থাকতেই ধরে খেয়ে ফেলে।

তবু আমাদের বিশ্বাস হলো না। যা কলকাতার বাজারে সারা বছর পাওয়া যায়, তা একজন গ্রামের মানুষ সারা জীবনে একবারও দেখেনি। এ কি হতে পারে?

হারাধন মহা বিস্ময়ের সঙ্গে সেই মাগুর মাছ কোটা দেখতে লাগলো রান্না-ঘরের দরজার সামনে বসে। এক সময় সে বলে ফেললো, মা, আমারে এক টুকরো দেবেন তো?

মা ধমক দিয়ে বললেন, যা রান্না হয়, তার কোন্‌টা তোমাকে দেওয়া হয় না? এখানে বসে বসে নজর দিতে হবে না, ওঠো তো!

দু'দিন বাদে হারাধনের একটা চুরি ধরা পড়ে গেল।

দুপুরের দিকে মা একটু ঘুমিয়ে নেন। আমারও দুপুরের ঘুম বেশ প্রিয়। যতদিন চাকরি পাচ্ছি না, ততদিন দুপুরের ঘুমটা আর ছাড়ি কেন? ছোট-কাকা টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়।

ছোড়দি এসে ঠ্যালা মেরে আমায় জাগিয়ে বললো, খোকন, এই খোকন, দেখবি আয়!

ছোড়দির মুখে ঠিক ভয় নয়, অদ্ভুত একটা বিস্ময়ের ঘোর। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আমাকে শব্দ না করার ইঙ্গিত করে ছোড়দি পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল রান্নাঘরের দিকে।

নিভে যাওয়া উনুনের ওপর অ্যালুমিনিয়ামের দুধের কড়াইটা চাপানো। আধ কড়াই ভর্তি দুধের ওপব একটা পাতলা সর পড়েছে। একটা মস্ত বড় হুলো বেড়ালের মতন উপুড় হয়ে হারাধন সরাসরি সেই কড়াই থেকেই চুমুক মারছে দুধে।

আমাদের উপস্থিতিতে তার ভ্রূক্ষেপ নেই!

আমি চুলের মুঠি ধরে তাকে টেনে তুললুম। তার গোঁফ দাড়িতেও দুধ লেগে গেছে।

ভয়ের কোনো লক্ষণ নেই তার মুখে। বরং একটু লজ্জা লজ্জা ভাব করে বললো, দশ-বারো বছর দুধ খাই নাই! কেমন খেতে লাগে ভুইলেই গেছিলাম। তাই একটু ইচ্ছে হলো···

আমি নিজেও তো দশ বারো বছর চুমুক দিয়ে দুধ খাইনি। চায়ের সঙ্গে যে-টুকু দুধ পেটে যায়, দুধের সঙ্গে সেইটুকুই সম্পর্ক!

দাঁত কিড়মিড় করে আমি বললুম, হারামজাদা? আমাদের বাড়িতে

একেবারে ছোট বোনটা ছাড়া আর কে দুধ খায়? বাকি দুধটা তো চায়ের জন্য।

ছোড়দি বললো, ভাগ্যিস আমি দেখে ফেললুম! নইলে ওর এঁটোটা খেতে হতো।

হারাধন বললো, বড় ভালো সোয়াদ? আর একটু খাব ও দিদিমনি! সেই-দিনই হারাধনের চাকরি যাবার কথা।

কিন্তু ছোড়দির দয়ার শরীর। প্রথম অপরাধের জন্য ছোড়দি তাকে ছেড়ে দিতে চাইলো। ঘটনাটা কাউকে জানানো হলো না। পুরো দুধটাই হারাধনকে খেতে দিয়ে বলা হলো, সে যদি ভবিষ্যতে আর কোনো খাবারে মুখ দেয় কিংবা না বলে কোনো জিনিস নেয়, তাহলেই পুলিশে দেওয়া হবে তাকে।

সে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম জানিয়ে বললো যে আর কখনো সে না জানিয়ে কিছু খাবে না!

কড়াইটা উল্টে দোষ দেওয়া হলো পাশের বাড়ির পোষা বেড়ালটার নামে।

এরপর কয়েকদিন ছোড়দি আর আমি পালা করে দুপুরবেলা গোপনে লক্ষ্য করেছি। হারাধনের আর কোনো চৌর্যকর্ম চোখে পড়েনি।

গৌতমকাকা বাবার চিঠি পেয়ে দেখা করতে এসে একটা দুঃসংবাদ দিলেন।

সরকারের কাছে তাঁর আড়াই লাখ টাকা বিল বাকি পড়ে আছে, তাঁর মাটি-কাটার ব্যবসা আপাতত লাটে উঠে গেছে। মজুরদের প্রাপ্য টাকা দিতে পারছেন না বলে তিনি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

হারাধনকে দেখে তিনি মুখ বাঁকিয়ে বাবাকে বললেন, এরকম একটা মুস্কো জোয়ানকে বাড়িতে রেখেছ, তুমি কি পাগল নাকি? আজই একে বিদায় করে দাও। দিনকাল খারাপ, কখন কিসে কী সর্বনাশ হয়ে যায়, কোনো ঠিক নেই।

হারাধনকে অবশ্য তখনই তাড়ানো হলো না। পাগলাটে মানুষটা এমনিতে

নিরীহ, হাজার ধমক দিলেও প্রতিবাদ করে না। মাঝে মাঝে জিনিসপত্র ভাঙে, এর মধ্যে দুটো কাঁচের গেলাশ আর একটা কাপ ভেঙেছে; দোকান থেকে কোনো জিনিস আনতে বললে অন্য একটা নিয়ে আসে, তবু কোনো কাজেই তার না নেই। আমাদের ঠিকে ঝি-টা আবার দিন চারেক ধরে আসছে না।

এমনকি মা-ও হারাধনকে একটু একটু পছন্দ করে ফেলেছেন। হারাধনের এক একটা অদ্ভুত কথা শুনে তিনি হেসে গড়াগড়ি যান! ছোড়দির বান্ধবীরা বেড়াতে এলে ছোড়দি হারাধনকে ডেকে তার বোকামির নিদর্শনগুলি দেখিয়ে বান্ধবীদের আনন্দ দেয়।

দিন পনেরো কেটে যাবার পর একটা মজার কাণ্ড হলো।

সেদিন রবিবার। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর বাবা পাশের বাড়িতে তাস খেলতে যান। মা খবরের কাগজের রবিবারের পাতা শেষ করে বেলা করে ঘুমোন। হঠাৎ দরজায় একটা আওয়াজ পেয়ে মা ভাবলেন, কোনো কারণে তাস খেলা বন্ধ, তাই বাবা আজ ফিরে এসেছেন।

বিছানায় তার পাশে একজনের শুয়ে পড়ার শব্দ হলো। অন্য দিকে ফিরে কাগজ পড়তে পড়তে মা জিজ্ঞেস করলেন, আজ আর খেলা হলো না বুঝি? তোমাকে কতদিন বলেছি, সুমিতা পছন্দ করে না···

উত্তরের বদলে একটা অন্যরকম হাসির শব্দ শুনে মা চমকে পাশ ফিরলেন। তিনি দেখলেন দাড়িগোঁফওয়ালা একটা বিকট মুখ, সেই মুখখানা খুশিতে জ্বলজ্বল করছে।

বিরাট আর্তনাদ করে মা পালাবার চেষ্টা করতেই গড়িয়ে পড়ে গেলেন খাট থেকে।

আরশোলা দেখে ভয় পায় ছোড়দি। মায়ের ওসব বাতিক নেই। এমনকি আমার মায়ের ভূতের ভয়ও নেই। মার গলায় ওরকম চিৎকার আমরা কখনো শুনিনি!

আমরা সবাই ছুটে গেলুম এক সঙ্গে।

খাটের ওপর, ঠিক পাখার নিচে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে হারাধন।

খাটের গদিতে সে একটু একটু দোলবার চেষ্টা করছে।

একটা ক্রিকেট ব্যাট তুলে ছোটকাকা যেভাবে মারতে উঠেছিল, সেটা ঠিক মতন লাগলে হারাধন বোধহয় তক্ষুনি খুন হয়ে যেত। ছোড়দি ছোট কাকার হাতটা ধরে ফেললো।

তারপর চললো লাথি ঘুঁষি।

হারাধনের মুখে একটিও শব্দ নেই। যেন সে ধরেই নিয়েছে এই সব মার তার প্রাপ্য। কোনো প্রশ্নেরও সে উত্তর দেয় না। লোকটার অকৃতজ্ঞতা-তেই আমাদের সকলের চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে ঘৃণা। একটা জেলখাটা ডাকাত জেনেও ওকে এবাড়িতে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল, তার এই প্রতি-দান!

মায়ের ধারণা, হারাধন ওঁর গলা টিপে ধরতে চেয়েছিল!

খবর পেয়ে বাবা ছুটে এলেন পাশের বাড়ি থেকে। এখন বাবাকে সামলানোই একটা বড় কাজ আমাদের। বাবার খুব ব্লাড প্রেশার আছে।

বাবা কিন্তু রাগারাগি করলেন না একেবারেই। গুম হয়ে তাকিয়ে রইলেন এক দৃষ্টিতে। তাঁর মুখে নিদারুণ দুঃখের ছাপ ফুটে উঠেছে। যেন খুব অন্যায়ভাবে তাঁকে কেউ কোনো একটা খেলায় হারিয়ে দিয়েছে।

আমার মায়ের বিছানার পাশে গিয়ে হারাধন শুয়েছে, এই কথাটা জানা-জানি হয়ে গেলেই পাড়ার লোক অনেক কথা বলতে পারে। তারপর কী ঘটছে না ঘটছে, তা কেউ শুনতে চাইবে না। যাদের জিভ সব সময় শুড়শুড় করে, তারা যা ইচ্ছে বানাবে।

এই ব্যাপারটা ছোড়দি বুঝতে পেরে বললো, বাবা, আর চেঁচামেচি করার দরকার নেই। ওকে বরং বনগাঁয় পাঠিয়ে দেওয়া যাক।

বাবা যুক্তিটা মানলেন। ছোটকাকা আর আমার ওপর সেই ভার দেওয়া হলো।

হারাধনের দিকে তাকিয়ে বাবা শুধু গম্ভীরভাবে বললেন, তুই আর কোনোদিন কলকাতা শহরে ভিক্ষে করতেও আসবি না। তাহলে কিন্তু

কেউ আর তোকে বাঁচাতে পারবে না।

শিয়ালদায় পৌঁছে হারাধনের কাছে আমাকে পাহারায় দাঁড় করিয়ে ছোটকাকা গেল টিকিট কেটে আনতে।

মার খেয়ে হারাধনের মুখ ফুলে গেছে। থুতনির কাছে তার কেটেও গেছে খানিকটা। কিন্তু তোকে মোটেই বিমর্ষ দেখাচ্ছে না। বরং বনগাঁয় ফিরে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে সে উৎফুল্ল।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, হারাধন, সত্যি করে বল তো, তুমি এটা করতে গেলে কেন ? মা তোমাকে কোনোদিন কম খাবার দিয়েছে ? তোমাকে একটা জামা কিনে দেওয়া হলো পরশুদিন।

হারাধন বললো, জামা তো আমার একটা ছিলই। আর জামা লাগতো না !

আমি বললুম. তোমার জামাটা ছেড়া আর নোংরা। সেই জন্যই একটা নতুন জামা দেওয়া হলো। ছোড়দি সেদিন···

হারাধন আবার বললো, জামা লাগতো না। কিন্তু আমি কোনোদিন গদির বিছানায় শুই নাই। মাথার উপরে পাখা ঘোরে, গদির বিছানা, তাই ভাবলাম, জীবনটা ব্রেথা যাবে, কোনোদিন শোব না ? তাই একটু বড়বাবুর মতন···হে হে হে, বড় ভালো লাগছে ! একটু মার খেয়েছি, তাতে কী হয়েছে, বড় ভালো লেগেছে গো বাবু !

আমার দিকে জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে সে হাসতে লাগলো পরম পরিতৃপ্তিতে।



শিকার কাহিনী

মেয়েটিকে দেখলেই বোঝা যায়, সে আগে কখনো কলকাতায় আসেনি। হাওড়া স্টেশনে সকাল পৌনে দশটায় ভিড়ের মধ্যে সে স্পষ্টতই একা। একটা হলদে ডুরে তাঁতের শাড়ি পরা। কপালে লাল টিপ। সিঁথিতে অনেকখানি সিঁদুর। তার বয়েস তেইশ চব্বিশের বেশি না। পাতলা দোহারা চেহারা। একটু বেশি লম্বা বলে হিলহিলে ভাব আছে। তার চোখে প্রতিফলিত হচ্ছে প্রথম দেখা শহরের ছবি!

অফিস টাইমে, সবাই ব্যস্ত। হুড়োহুড়িতে মত্ত। এমন সময় সিঁথিতে অতখানি সিঁদুর দেওয়া কোনো রমণীকে মানায় না। সে জনস্রোতে ধাক্কা খাচ্ছে। কেউ কেউ ইচ্ছে করে তাকে খোঁচা মারছে। সে স্রোতের ফুলের মতো দুলছে এদিক ওদিক।

তার হাতে একটা ছোট চটের থলি, অন্য হাতে একটি পোস্ট কার্ড। সে একজন মহিলার সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাকুলভাবে বলছে, ও দিদি, ও দিদি!

সবাই কাঁটায় কাঁটায় সময় ধরে ট্রেনে চাপে। হাওড়ায় নেমেই ছুটে গিয়ে বাসের জন্য লাইনে দাঁড়াতে হয়। নইলে লেট মার্ক পড়ে। এখন কি কারুর একটা বাজে হাতে-লেখা পোস্টকার্ড পড়ার সময় আছে? তবু কেউ কেউ দাঁড়ায়। সমস্ত শরীরটা অস্থিরতায় দুললেও সহানুভূতির সঙ্গে মেয়েটির কথা শুনতে চায়। শুনে, অসহায় ভাব করে।

পোস্টকার্ডটায় এক-পিঠে একটা ঠিকানা লেখা আছে। তারা-মা কেমিক্যাল ওয়ার্কস। ৩।২, গণেশ সাহা লেন। কলিকাতা।

এরকম একটা অজ্ঞাত রাস্তা কে চিনবে? পোস্টাল জোন পর্যন্ত লেখা নেই।

একজন মধ্য বয়স্কা, ফরসা, গালভারি চেহারার মহিলা সমস্ত পোস্টকার্ডটি পড়লেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি একলা এসেছো? কলকাতায় তোমার আর কেউ চেনা নেই?

মেয়েটি দু' দিকে মাথা নাড়লো।

মহিলা বললেন, এ রকম হুট করে কি কেউ আসে? কলকাতা শহর··· বড় কঠিন জায়গা!

মহিলাটি বেশ জোরে জোরে কথা বলছেন, তাঁর চেহারার একটা আকর্ষণ আছে। তাই তাঁকে ঘিরে ছোটোখাটো একটা ভিড় জমে যায়।

মহিলাটি অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনাবা কেউ গণেশ সাহা লেন চেনেন?

একজন বললে, ভবানীপুবে বোধহয়। আর একজন বললে, বাগবাজারে। আব একজন বললো, বড়বাজারে গণেশ দাস লেন আছে একটা। আর একজন বললো, কলকাতাতে নয়, তারা-মা কেমিক্যাল ওয়ার্কস তো দক্ষিণেশ্বরে।

মহিলাটি বাগ রাগ চোখ কবে অন্যদেব দিকে তাকিয়ে বললেন, কেউ এই মেয়েটিকে পৌঁছে দিতে পারবেন?

অমনি ভিড় পাতলা হয়ে গেল।

ফরসা মহিলাটি এই পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের বউটিকে বললেন, আমার হাতে তো একদম সময় নেই ভাই। না হলে আমি একটা কিছু ব্যবস্থা করতাম। তুমি বরং পুলিশের কাছে গিয়ে খোঁজ করো।

মহিলাটি পোস্টকার্ডটি ফেরত দিয়ে এগিয়ে গেলেন। একটুখানি গিয়ে আবার পেছন ফিরে বললেন, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, যাও।

মেয়েটি তবু মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে রইলো। পুলিশ শব্দটি তাকে কাঁপিয়ে

দিয়েছে। জন্ম থেকেই সে জেনে এসেছে, পুলিশের কাছাকাছি যেতে নেই। প্রজাপতি যেমন চড়াই পাখির কাছে যায় না, চড়াই পাখি যেমন বেড়ালের কাছে যায় না।

কলকাতা পুলিশ কি আর অন্যরকম হবে?

একটা ট্রেন পৌঁছে গেছে। পরবর্তী ট্রেন একটু পরে আসবে। মাঝখানের সময়টায় প্ল্যাটফর্ম একটু ফাঁকা হয়।

তখন পাজামার ওপর নীল শার্ট পরা একটা লোক, চিমসে চেহারা, মুখ-খানা ছুঁচোলো ধরনের, একটা সিগারেট টানতে টানতে তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি বিষ্টুপদকে খুঁজতে এসেছো?

মেয়েটি আবার কেঁপে উঠলো। কেউ যেন তার হাতে চাঁদ গুঁজে দিলো এইমাত্র। এই লোকটা তার স্বামীকে চেনে?

লোকটি বললো, তুমি বিষ্টুদার বউ?

মেয়েটি এবার জোরে জোরে মাথা নাড়লো।

লোকটি আবার বললো, তারা-মা কেমিক্যালে বিষ্টু তো আমার সঙ্গেই কাজ করে। বিষ্টু বলছিল বটে, ছ'মাস বাড়ি ফেরা হয়নি। আমার বউটা নিশ্চয়ই খুব চিন্তা করছে। বিষ্টু গত সপ্তাহে তোমাকে একটা চিঠি লিখেছে, তুমি পাওনি।

মেয়েটি বললো, কই, না তো!

লোকটি বললো, বিষ্টু এখনো বাড়ি ভাড়া করতে পারেনি, তাই তোমাকে এখানে আনার ব্যবস্থা করতে পারেনি। আমার সঙ্গেই থাকে। তা বলে তুমি হুট করে চলে এলে? কানের ফুল দুটো কিসের, রূপোর? হাতের লোহাটা সোনা দিয়ে বাঁধানো, না পেতলের? আরে দিদি, এই সব গয়না পরে কোনো মেয়েছেলে একা একা কলকাতা শহরে আসে? এ কেমন জায়গা তা তো জানো না! পদে পদে বিপদ। ভাগ্যিস, আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। চলো!

মেয়েটি অসহায়ভাবে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাবো? আপনি আমাকে আমার স্বামীর কাছে নিয়ে যাবেন?

লোকটি বললো, হাওড়ায় শালকেতে আমাদের জায়গা। তার পাশেই আমার বাড়িতে বিষ্টু থাকে। তোমাকে দেখে বিষ্টু একেবারে অবাক হয়ে যাবে। তুমি এমনভাবে চলে এসেছো বলে বকুনিও দেবে তোমাকে। যাক গে, সে তোমরা বুঝবে!

লোকটির সঙ্গে এবার নিশ্চিন্তে এগোলো মেয়েটি। তার স্বামী তাকে বকুনি দেয় তো দিক! সেও কম বকবে না। ছ' মাস আগে এই একখানা পোস্টকার্ড এসেছিল তারপর মানুষটার আর কোনো পাত্তা নেই।

যেতে যেতে লোকটি বললো, আমার নাম ঘনশ্যাম। বিষ্টু আমাব কাছে সব কথা বলে। তোমার জন্য ওর খুব কষ্ট। তোমার নাম কী যেন! বিষ্টু বলেছে, ভুলে যাচ্ছি।

—সাবিত্রী। সাবিত্রী মাইতি।

—ও হ্যাঁ, সাবিত্রী। সকালে কিছু খেয়েছো? মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, খাওয়া হয়নি কিছু। সঙ্গে পয়সাকড়িও কিছু নেই নিশ্চিত। ছি, ছি, এভাবে কলকাতায় এসে পড়লে। আমার সঙ্গে দেখা না হলে কী বিপ-দেই যে পড়তে! নাও, একটু চা আর বিস্কুট খেয়ে নাও।

সাবিত্রীর চোখে জল এসে গেল। সারা রাস্তা সে ভয়ে ভয়ে এসেছে। ট্রেনেও দুটো লোক তাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিল। তবু সে এসেছে বেপরোয়া হয়ে। এখন একজন মানুষের মুখে এসব সহৃদয় কথা শুনলে তার কান্না আসবে না?

চা ও একখানা নোনতা বিস্কুট খেয়ে ওরা বেরিয়ে এলো স্টেশন থেকে। ভিড়ের জায়গাগুলো এড়িয়ে, পেছন দিকের ব্রিজের কাছে এসে একটা রিকশ ডাকলো ঘনশ্যাম। সাবিত্রীকে আগে তাতে ওঠালো। তারপর সে রিকশয় পা দিতে যাবে, এমন সময় একটা ঘটনা ঘটলো।

একটু দূর থেকে একজন হেঁড়ে গলায় ডাকলো, অ্যাই লট্‌কা!

সেই ডাক শুনে চোখ বড় বড় হয়ে গেল ঘনশ্যামের। মুখ ঘুরিয়ে আহ্বান-কারীকে দেখতে পেয়েই সে এক মুহূর্ত দেরি করলো না। পাঁই পাঁই করে ছুট দিলো প্রাণপণে। এঁকে বেঁকে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল কোথায়।

যে ডেকেছিল, তার পরনে একটা কালো রঙের প্যান্ট, ধূসর গেঞ্জি, গলায় একটা রুমাল বাঁধা। এক হাতে লোহার বালা, মাথার চুল তেল-চকচকে। বেশ মজবুত শরীর।

সে কাছে এসে সাবিত্রীকে আপাদমস্তক দেখলো, হুঁ। এই মেয়ে, তুমি ওর সঙ্গে কোথায় যাচ্ছিলে?

সাবিত্রীর বুক টিপটিপ করছে। ওই লোকটা তার স্বামীর বন্ধু, তাকে তার স্বামীর কাছে পৌঁছে দেবে বলেছিল, তবু হঠাৎ পালালো কেন? এবার তার কী হবে?

সাবিত্রী বললো, উনি আমাকে আমার স্বামীর কাছে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ঘনশ্যামবাবু কোথায় গেলেন?

মজবুত চেহারার ছোকরাটি বললো, ঘনশ্যাম? সাত জন্মে ওর নাম ঘনশ্যাম নয়। ওর নাম লটকা। ও ব্যাটা তো একটা শেয়াল! প্ল্যাটফর্মে ঘুরঘুর করে! ও তোমাকে কোথায় পৌঁছে দেবে বলেছিল? হা-হা-হা-হা।

হাসি থামিয়ে সে বললো, ব্যাটাকে ধরতে পারলে মাথা গুঁড়িয়ে দিতুম। আমার টাকা মারার তাল! ওগো মেয়ে, ও তোমাকে খাবার মতলবে ছিল!

সাবিত্রী বললো, না, না, উনি আমার স্বামীকে চেনেন। নাম বললেন, একসঙ্গে কাজ করেন!

—লটকা কাজ করে? ছোক ছোক করা ছাড়া আর কোনো কাজ ও জানে? তোমার হাতে ওটা কী?

—আমার স্বামীর চিঠি।

—ওই লটকা ব্যাটা কোনো ফাঁকে উঁকি মেরে চিঠিখানা দেখে নিয়েছে। তাই থেকেই বানিয়েছে যে তোমার স্বামীকে চেনে। ছেঃ! ব্যাটাকে ধরা গেল না। দেখি, ঠিকানাটা দেখি—

পোস্টকার্ডটা হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখে সে বললো, তারামা কেমিকেল! গণেশ সাহা লেন। শিবপুরে। আমাদের পাড়াতেই। দ্যাখা যাক,

সেখানে তোমার মরদকে পাওয়া যায় কিনা। সঙ্গে বসো!

এক লাফ দিয়ে রিকশয় উঠে বসে রিকশওয়ালাকে বললো, এই ব্যাটা, জোরে ছুটবি! টিকিস টিকিস করলে লাথি খাবি!

রিকশাটা ছুটতে শুরু করতেই যুবকটি বললো, ভয় নেই। আমি তোমায় ভালো জায়গায় রাখবো!

সাবিত্রী বললো, আমি আমার স্বামীর কাছে যাবো।

তা তো যাবেই। ওই লোকটার হাতে পড়লে কোনোদিন পৌঁছতে পারতে না; সোজা তোমাকে আসল পাড়ায় নিয়ে গিয়ে তুলতো।

—আমার স্বামীকে আপনি চেনেন?

—চিনি না। কিন্তু খুঁজে বার করতে কতক্ষণ। ঠিকানা যখন আছে। আজ না হয় কাল পাওয়া যাবে, কাল না হয় পরশু!

—আমি আজকেই যাব!

—যাবে, যাবে! ঠিক হয়ে বসো। কান্নাকাটি করো না। কোনো ভয় নেই। তুমি সিগ্রেট খাবে?

—আমি খাই না!

ব্রিজ পার হবার পরেই বৃষ্টি নামলো। রিকশর ছাউনি তুলে দিতে হলো। ছোকরাটি তখন তার একটা হাতে সাবিত্রীর কোমর বেষ্টন করলো! তারপর বেশ ভাব দিয়ে বললো, গ্রাম থেকে চলে এসেছো, ভালো করেছো। গ্রামে কি মানুষ থাকে? যত সব ক্যাংলা পার্টি! আমিও চলে এসেছি।

—একটু সরে বসুন। গায়ে হাত দিচ্ছেন কেন?

—তবে কি তোমার বুকে হাত দেবো, সোনা!

ঠিক এই সময় এমনভাবে একটা জিপ এসে থামলো সামনে যে রিকশটা উল্টে যেত আর একটু হলে।

একজন পুলিশ অফিসার ঝট করে জিপ থেকে নেমেই রিভলভার তুলে বললেন, এই ছোটেলাল, নাব, নাব। এদিক ওদিক করলেই কিন্তু খোপরি উড়িয়ে দেবো!

জিপ থেকে আরও একজন কনস্টেবলও নেমেছে। তার হাতে বেঁটে লাঠি।

ছোটেলাল একবার কোমরের কাছে লুকানো ছুরিতে হাত বুলোলো, কিন্তু বার করলো না। এই রজত দারোগা কতটা হিংস্র সে ভালো করেই জানে, সত্যি সত্যি গুলি চালিয়ে দিতে পারে। দু' মাস একে কোনো টাকা দেওয়া হয়নি। রোজগারপাতি যে এখন কম, তা এই দারোগা বুঝবে না।

দারোগাটির পেটানো চেহারা, চওড়া বুক, সরু মধ্য দেশ। চোখ দুটি অত্যুজ্জ্বল। সে বললো,হারামজাদা, আমার হাত এড়িয়ে পালাবি ক'দিন? আমি ইচ্ছে করলে ধরতে পারিনি, এমন কালপ্রিট জন্মায়নি আজও! সঙ্গে আবার ভালো চেহারার মেয়ে জুটিয়েছিস! দিন-দুপুরে মেয়ে নিয়ে রিকশয় ঘুরছিস, তোর পাখা গজিয়েছে দেখছি!

কনস্টেবলটিকে সে বললো, ওর হাত দুটো পিছ মোড়া করে বাঁধো। দেখো, সাবধান, এটা একেবারে নেকড়ের মতন শয়তান। ছুরি থাকে, বার করে নাও আগে।

ছোটেলাল বললো, বড়বাবু, এই মেয়েছেলেটি ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছিল না, তাই ওকে পৌছে দিচ্ছিলুম!

দারোগাটি মাথা ঝাঁকিয়ে প্রবল জোরে হেসে উঠলো।

তারপর বললে, তুই পৌছে দিচ্ছিলি? অ্যাঁ? কেন, তোর বুঝি খিদে নেই?

ছোটেলাল বললে, বড়বাবু, আপনি তবে ওকে নিন। আমাকে ছেড়ে দিন এবারটির মতন!

দারোগা গর্জন করে বলে উঠলো, চোপ! ওর কথা তোকে চিন্তা করতে হবে না!

তারপর ছোটেলালের চুলের মুঠি ধরে বললো, ওঠ গাড়িতে! এবার তোর মাথা যদি ভেঙে না দিই তো আমার নাম মাধব সরদার নয়!

ছোটেলালকে জিপের মধ্যে ঠেলে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে বেশ নরম গলায়

দারোগাটি সাবিত্রীকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কবে থেকে লাইনে নেমেছো ? আগে তো দেখিনি !

সাবিত্রী সিঁটিয়ে গিয়ে বললো, বাবু, আমি পুরুলিয়া থেকে এসেছি, আমার স্বামীকে খুঁজতে। এই যে আমার স্বামীর চিঠি !

পোস্টকার্ডটি হাতে নিয়ে দারোগাটি সব পড়লো। তারপর বললো, ঠিক আছে। একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ওঠো, জিপে এসো !

সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসলো দারোগা, তার পাশে বসালো সাবিত্রীকে। সাবিত্রী কখনো এরকম গাড়িতে চড়েনি।

একটু পরে দারোগাটি জিজ্ঞেস করলো, তোমার স্বামী তোমাকে একলা গ্রামে ফেলে কলকাতায় চাকরি করতে এলো ?

সাবিত্রী বললো, এখান থেকে কয়েকজন বাবু গিয়েছিল আমাদের গ্রামে ! তারা ওকে বললো, কলকাতায় চাকরি দেবে। ভালো মাইনে, কারখানায় কাজ। বাবুরাই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো।

—হুঁ, বাবুরা সঙ্গে করে নিয়ে এলো ! কী রকম বাবু কে জানে। তোমাকে একা রেখে এলো ?

—ওখানে আমার এক বুড়ি পিসিমা থাকে। ও বলেছিল, এক মাসের মধ্যে আমাকে পুরুলিয়া থেকে কলকাতায় নিয়ে আসবে !

—তারপর আর পাত্তা নেই ? এই একটা মাত্র চিঠি লিখেছে।

—আমি দু'খানা পত্তর পাঠিয়েছি, কোনো উত্তর পাইনি।

—হুঁ, তাহলে কলকাতায় অন্য কোনো মেয়ের পাল্লায় পড়ে মজেছে। তোমাকে ভুলে গেছে।

—না গো, বাবু, না না, সে তেমন মানুষই নয়।

—কে কখন বদলে যায়, তা কি বলা যায় ? এ তো আর গ্রাম নয়, শহর বড় মজার জায়গা। তা তুমি চলে এসে ভালো করেছো। গ্রামে থাকলে তো খেতেই পেতে না। শুধু শুধু এমন শরীরটা নষ্ট করতে।

—বাবু আমার এখন কী হবে ?

—ব্যবস্থা হয়ে যাবে, ঠিক একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে !

—থানার কাছে এসে জিপটি থামতেই দারোগাটি কনস্টেবলকে বললো, তুমি ছোটেলালকে গারদে নিয়ে যাও একটু দলাই মলাই করো। আমি আসছি। এই মেয়েটাকে কোনো আশ্রম টাশ্রমে পৌছে দিতে হবে তো!

ছোটেলাল জিপ থেকে নামবার পর ঠোঁট বেঁকিয়ে বললো, আশ্রম না ছাই। ওগো, মেয়ে, তুমি এবার বাঘের খপ্পরে পড়লে!

জিপের ড্রাইভার এবং কনস্টেবল দু'জনেই গোঁফের ফাঁকে হাসলো।

জিপ ছাড়তেই সাবিত্রী বললো, আমি আশ্রমে যাবো না! আমি স্বামীর কাছে যাবো।

দারোগা বললো, যাবে, যাবে, যেখানেই যাও, অত তাড়াহুড়ো কিসের? পুলিশের হাতে পড়েছো। এজাহার দিতে হবে না? ড্রাইভার, আগে গেস্ট হাউজ চলো।

এই থানার মধ্যে কয়েকটা জুট মিল আছে। তার মধ্যে একটির রয়েছে চমৎকার গেস্ট হাউজ। গঙ্গার ধারে, নিরিবিলি। সব রকম খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা। দারোগাবাবু সে গেস্ট হাউজ যখন তখন ব্যবহার করতে পারে।

বাঘের যেমন স্বভাব, দেরি সহ্য হয় না। খিদে পেয়েছে, সামনে খাদ্য তৈরি, সন্ধ্যের অন্ধকার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবে না। তাকে বাধা দেবারও কেউ নেই। বাঘকে কে না ভয় পায়।

জিপটা এসে থামলো বাগান বাড়ির পেছন দিকে। সেখানে একটা ছোট দরজা। দারোগাকে দেখে একজন আর্দালি সসম্ভ্রমে দরজা খুলে দিলো। সাবিত্রী ভয়ের চোটে নামতে চাইছিল না, তাকে টেনে হিঁচড়ে আনা হলো ভেতরে।

কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দারোগা তার ঘাড় কামড়ে ধরে গর-গর করতে করতে বললো, চেঁচাবি না, হারামজাদি, তাহলে এক্ষুনি শেষ করে দেবো। চুপচাপ থাক, দু'তিনদিন পর স্বামীর কাছে পৌছে যাবি।

দোতলার বড় ঘরটির দরজা ঠেলে খুলতেই অন্য দৃশ্য!

লোকে বলে, এক অরণ্যে বাঘ আর সিংহ একসঙ্গে বাস করে না। কিন্তু শহরে ও নিয়ম খাটে না। এখানে বাঘেরও বাবা আছে। বাঘ আর সিংহ দিব্যি সহাবস্থান করতে পারে।

এই ঘরটার সোফায় গা এলিয়ে বসে আছে সাতখানা জুট মিলের মালিক দুর্জয় সিং। বিশাল চেহারা। চোখ দুটো ভাটার মতন। মাথায় পরচুলা। সে ঘনঘন নিশ্বাস ফেলছে।

দারোগাকে দেখেই দুর্জয় সিং হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো, এই যে দারোগা-বাবু, আপনি আমার দু'জন লোককে অ্যারেস্ট করেছেন? আপনাকে প্রতি মাসে মোটা খাওয়াচ্ছি, তাতে হয় না। মন্ত্রীদের দিয়ে টেলিফোন করতে হবে?

দারোগা খানিকটা কুঁকড়ে গিয়ে বললো, আপনার লোককে ধরেছে? কই, আমি জানি না তো!

দুর্জয় সিং আবার ধমক দিয়ে বললো, আপনি জানেন না? তাদের এমনি এমনি ফটকে পুরলো? বাঁকুড়ায় ট্রান্সফার হতে চান, না সাসপেণ্ড হতে চান!

দারোগা বললো, নিশ্চয়ই ভুল করে ধরেছে। আমি দেখছি। একটু পরেই থানায় গিয়ে দেখছি।

দুর্জয় সিং বললো, একটু পরে কেন, এক্ষুণি যান? ডিউটি ফেলে রাখবেন না! এখানে এখন কী করতে এসেছেন?

দারোগা বললো, এই মেয়েটা স্যার, হারিয়ে গেছে। ছোটেলালের খপ্পরে পড়েছিল। এর সঙ্গে ক্রিমিন্যালদের কোনো কানেকশান আছে কি না, তা একটু জেরা করে দেখতে হবে। সেইজন্যই নিরিবিলিতে···বেশিক্ষণ লাগবে না, বড় জোর চল্লিশ মিনিট।

দুর্জয় সিং এই প্রথম সাবিত্রীকে দেখলো। উঠে এসে, একবার সামনে, একবার পেছনে, একবার থুতনি তুলে।

তারপর বললো, বাঃ, এ যে একেবারে ফ্রেস মাল দেখছি। কোথায় পেলে?

—আজই ট্রেন থেকে নেমেছে।

—বা-বা-বা-বা ! অজকাল যতই টাকা খরচ করুন, ফ্রেস কিছুতেই পাওয়া যায় না। সবই কোল্ড স্টোরেজ আর ডিপ ফ্রিজের মাল। জানেন তো, যতই খুবসুরত হোক, আর এসব পোশাকের বাহার থাকুক, ফ্রেস জিনি-সের স্বাদই আলাদা। এখানে একে আপনি জেরা করবেন ?

—হ্যাঁ, স্যার।

—আপনি থানায় গিয়ে ডিউটি করুন। আমি জেরা করছি। আজ আমার মনমেজাজ ভালো নেই। দেখি, এই ফ্রেস জিনিসটি খেলে আমার তবিয়ৎ ঠিক হয় কী না।

দারোগাটি দুর্জয় সিং-এর চোখের দিকে তাকালো। নিজের লেজটা আছড়াতে আছড়াতে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে গরগর করতে করতে বললো, না একে আমিই জেরা করবো। বলছি তো বেশিক্ষণ লাগবে না।

দুর্জয় সিং হেসে বললো, ঠিক আছে, একদিনের জন্য জামিন তো দিতে পারেন ? একদিন জামিন রাখলে কত লাগবে বলুন। তারপর কাল আপনি যত ইচ্ছে জেরা করবেন। কত লাগবে, কত ?

পকেট থেকে এক মুঠো একশো টাকার নোট বার করে সে ছুড়ে দিলো দারোগার বুকে। নোটগুলো কুড়িয়ে নিয়ে দারোগা একবার তাকালো সাবিত্রীর দিকে, আর একবার দুর্জয় সিং-এর দিকে। তারপর ঠোঁট চাটতে চাটতে পিছিয়ে গেল এক পা এক পা করে।

দুর্জয় সিং বললো, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যান।

সিংহ সমাজে একটা নিয়ম আছে। পুরুষ সিংহরা বসে থাকে এক জায়-গায়, সিংহিনীরা শিকার করে। সিংহিনী সব জোগাড় করে দেয়, সিংহ দয়া করে খায়। তারপর সিংহিনীই সিংহের গা চেটে পরিষ্কার করে দেয়।

এখানেও সেরকম একটা কিছু ঘটলো।

একটা এয়ারকণ্ডিশান্ড গাড়ি এসে থামলো প্রধান দরজায়। খুব ফরসা, স্থুলাঙ্গিনী, চোখে কালো চশমা পরা এক মহিলা সেই গাড়ি থেকে

নেমেই ধুপধাপ করে উঠতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে। একজন আর্দালি কিছু বলতে এলো তাকে, সে এক ঠেলায় সরিয়ে দিলো তাকে। তারপর ওপরে এসে ধাক্কা মেরে খুলে ফেললো দরজা।

দুর্জয় সিং তখন সবেমাত্র সাবিত্রীর আঁচলটা খুলে ফেলেছে, ঘুরে দাঁড়িয়ে গর্জন করে বললো, কে ?

স্থূলাঙ্গিনী মহিলাটি তা গ্রাহ্য না করে সাবিত্রীর দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললো, এ কে ?

দুর্জয় সিং কোনো উত্তর দিলো না।

মহিলাটি নাক কুঁচকে বললো, ছিঃ, এই তোমার রুচি হয়েছে ? অ্যাংলো মেয়ে, বম্বের ফিল্‌ম অ্যাকট্রেস, অ্যামেরিকান হিপি, কলেজে পড়া বাঙালি মেয়ে, এসব কোনো কিছুতেই আমি আপত্তি করি না। খাও না, যতো ইচ্ছে খাও। তা বলে এই নোংরা, গরিব, গাঁইয়া চাই তোমার ? এর কত, কোন্ রোগ আছে তার ঠিক কী ? ছি ছি ছি ছি, তুমি খানদানী মুসলমান, পাহাড়ী মেয়ে, অফিসারের বউ কী চাও বলো ? এটাকে দূর করে দাও !

তারপর পা থেকে চটি খুলে সাবিত্রীকে মারতে মারতে বলতে লাগলো, বেহুদা, রেণ্ডি কাঁহিকা ! দূর হয়ে যা ! মর, তুই মর। তোকে শিয়াল-কুকুরে খাক ! তুই এসেছিস সিংহের গুহায়।

মার খেয়ে সাবিত্রী মাটিতে পড়ে যেতেই স্ত্রীলোকটি হাঁক দিলো, আর্দালি, এই রেণ্ডিটাকে অনেক দূরে মাঠের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসো।

নদীর ধারে, একটা আবর্জনার স্তূপের ধারে বসে সাবিত্রী এখন অঝোরে কাঁদছে। শুধু কেঁদেই চলেছে। সে এখন কোথায় যাবে, তা জানে না। এরপর কী।

কোনো কবি হলে এই জায়গায় হয়তো লিখতেন, এক সময় সাবিত্রীর প্রতিটি অশ্রুবিন্দু মুক্তো হয়ে ঝরতে লাগলো, যাদের হৃদয়ে পরিতাপ থাকে, তারাই শুধু দেখতে পায় সেই মুক্তো, তারা হাত জোড় করে

সাবিত্রীর সামনে এসে বসলো।

কোনো পেশাদার প্রগতিশীল হলে বলতেন, সাবিত্রীব চোখের জলের ফোঁটাগুলো আসলে এক একটি অগ্নি স্ফুলিঙ্গ। ক্রমশ সেই সব অগ্নি স্ফুলিঙ্গ থেকে দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন, সেই আগুন পুড়িয়ে ছারখার করে দিলো দুর্জয় সিংহের মতন অত্যাচারীদের।

কিন্তু সে রকম কিছুই ঘটলো না। সাবিত্রী শুধুই অসহায় ভাবে কেঁদে চলেছে।

গল্প লেখকেব মুশকিল, এভাবে গল্প শেষ করা যায় না। ধবা যাক, অন্য একজন পুলিশ অফিসার, কিছু কিছু পুলিশ তো সৎ ও ভদ্র থাকতেই পারে, তাদের একজন সাবিত্রীকে পৌঁছে দিলো তার স্বামীর কাছে। তাহলে কিন্তু সেটা গল্প হবে না। কিংবা এক সহৃদয় ভদ্রলোক কিংবা তরুণ আদর্শবাদী সাবিত্রীকে যত্ন করে তুলে দিলো পুরুলিয়ার ট্রেনে। বাস্তবে এরকম ঘটে, কিন্তু ছাপার অক্ষরে পড়লে সবাই বলবে, বাজে গল্প।

সুতরাং সাবিত্রী ওখানেই বসে থাক, কাঁদুক।

শুধু অসমাপ্ত গল্পের অস্বস্তিতে আর সাবিত্রীর কান্নার শব্দে লেখকের একটা দিন মন-খারাপ অবস্থায় কাটবে।

ভীষ্মের দীর্ঘশ্বাস

তৃষ্ণার্ত রাজা এসে থামলেন এক স্বচ্ছ সরোবরের সামনে।

নিজের সৈন্যবাহিনী থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। কী যেন মোহ ভর করেছিল তাঁর ওপর, তিনি মানুষের কথা ভুলে গিয়ে অরণ্যের শোভায় মুগ্ধ হয়ে ক্রমশ একাকী চলে এসেছেন গভীর থেকে গহনে।

রাজা ঘোড়া থেকে নেমে সেই জলাশয়ের ধারে বসে আঁজলা ভরে পান করতে যাবেন, এমন সময় কয়েকটি নারী কণ্ঠ এক সঙ্গে বলে উঠলো হে রাজন! এই জল ছুঁয়ো না। এই জল পান করো না। তুমি অন্য সরোবরে যাও!

রাজা মুখ তুলে দেখছিলেন তিনটি যুবতী সেই সরোবরে হংসের মতো ভাসছে। হলুদ রেশমের মতো তাদের মুখ, পদ্ম-পলাশ চক্ষু, উড়ন্ত পাখির মতো ওষ্ঠাধর।

রাজা কয়েক মুহূর্ত অপলক ভাবে চেয়ে রইলেন।

রমণী বিলাসে তিনি কাটিয়েছেন বহু বছর, দেশ-বিদেশের বহু নারী তাঁর অঙ্কশায়িনী হয়েছে, কিন্তু তাঁর মনে হলো এই যুবতীত্রয়ী প্রত্যে-কেই যেন তিলোত্তমা।

একটি মেয়ে একটু এগিয়ে এসে মধুর হেসে বললো, রাজা, আমরা নিরালায় এখানে কেলি করছি, এখানে অবস্থান করা তোমার উচিত নয়। এই জল তোমার পেয় নয়, তুমি শীঘ্র অন্যত্র যাও।

রাজা বললেন। আমি,বরবর্ণিনী, তোমাদের দেখে আমার তৃষ্ণা শতগুণ বৃদ্ধি পেল। চোখের সামনে স্বাদু পানীয় দেখলে কি কোনো তৃষ্ণার্ত দূরে চলে যেতে পারে? কেন আমাকে নিবারণ করছো? কেন আমাকে চলে যেতে বলছো?

সেই মেয়েটি বললো, রাজা, সব ফুলের ঘ্রাণ নিতে নেই, সব পানীয় পান করা যায় না, সব ফল ভক্ষণ করা ঠিক নয়। এই সরোবর তোমার জন্য নয়, তুমি অন্য কোথাও যাও!

রাজা এবারে হেসে বললেন, তোমরা আমার পরিচয় জানো না। আমি রাজা, কোনো প্রকার নিষেধ শুনানই আমাদের বাসনা বেশি বলবান হয়। যে কোনো নিষিদ্ধ বস্তুই আমরা জয়-সাধ্য মনে করি। আমি অচিরেই তৃষ্ণা মেটাবো।

তিন নারী আবার একত্রে কলকণ্ঠে বলে উঠলো, রাজা অমত করো না, এমন করো না! নিবৃত্ত হও!

রাজা শুনলেন না। তিনি গণ্ডূষ জল পান করলেন। তারপর তাঁর বস্ত্র খুলে রেখে নেমে পড়লেন সরোবরে।

রাজা সন্তরণ-পটু। জলাশয়টিও তেমন বড় নয়। রাজা ভাবলেন, মেয়ে তিনটি পালাবার চেষ্টা করলেও তিনি অন্তত একজনকে বাহুবন্ধনে আনতে পারবেন ঠিকই। এরা অপ্সরা হলেও নিষ্কৃতি নেই।

যুবতী তিনটি কিন্তু দূরে সরে গেল না। বক্ষ জলে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলো।

রাজা কাছে আসতেই তারা বলে উঠলো, নিয়তি, নিয়তি!

রাজা এদের মুখপাত্রীটির হাত ধরলেন। তারপর বললেন, কবিতা এবং বনিতা স্বয়পসত্তা হলেও সুখদা হয়। হে সুন্দরী, আমি বলপ্রয়োগ করতে চাই না। আমি তোমার রূপ প্রার্থনা করি, তুমি আমার হও।

মেয়েটি তবু হাসতে লাগলো।

রাজা মেয়েটিকে বক্ষে জড়িয়ে ধরে মুখ চুম্বন করতে গেলেন।

কিন্তু পারলেন না। তাঁর বিচিত্র এক অনুভূতি হলো। তাঁর শরীরে।

বিদ্যুৎ নেই, শিহরণ নেই। এমন এক দুর্লভ রূপসীকে তিনি স্পর্শ করেছেন, তবু তাঁর কামনা যথোচিত জাগ্রত হচ্ছে না কেন?

মেয়েটি বললো, নিয়তি, নিয়তি!

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, কী বলছো, তুমি? কার নিয়তি?

মেয়েটি বললো, তোমার! হায় ভূতপূর্ব রাজা তুমি আর ইহজীবনে কোনো রমণী-রমন সুখ পাবে না।

—কেন?

—নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ!

রাজা আপন শরীরের দিকে তাকিয়ে আমূল চমকে উঠলেন।

তিনি আর রাজা নেই। তিনি এক নারীতে পরিণত হয়েছেন। আর তিনটি নারীরই মতো।

সেই তিন রমণীর মধ্যে একজন বললো, তোমাকে এখন কী বলবো, রাজা না রানী! শুধু রমণীই বলি। ওহে রমণী, আমরা দিব্যাঙ্গনা। পৃথিবীর কোনো পুরুষ আমাদের স্পর্শ করতে পারে না। এটা একটা মায়াসরোবর। সাধারণ মানুষ এটা দেখতেও পায় না। তোমার নিয়তি তোমাকে এখানে টেনে এনেছে।

পর মুহূর্তেই তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। চিনিয়ে গেল সেই মায়াসরসী। সবটাই যেন স্বপ্ন।

কিন্তু ভূতপূর্ব রাজার শরীরটা স্বপ্ন নয়। তিনি রমণী হয়েই রইলেন। কিন্তু নগ্ন বলে তাঁরা ব্রীড়া এলো তিনি প্রথমে স্তনদ্বয় ঢাকলেন দু হাত দিয়ে। তারপর এক হাত বুকে রেখে, অন্য হাতে চাপা দিলেন নিম্ননাভি, তাঁর ভঙ্গিটি হলো চিরকালীন প্রথাসিদ্ধ নিরাবরণ নারীর মতোই।

রাজার অশ্ব আর রাজাকে দেখতে না পেয়ে ফিরে গেল।

রাজা আস্তে আস্তে তাঁর রাজ্য, তাঁর মহিষীবৃন্দ, তাঁর সন্তানাদির কথা ভুলতে লাগলেন। অরণ্যের মধ্যে একাকিনী অবস্থায় তাঁর ভয় করতে লাগলো।

অসহায় ভাবে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে কিছুক্ষণ পরে তিনি এক

নবীন যুবার সাক্ষাৎ পেলেন।

যুবকটি ঋষি-কুমার, অঙ্গে গেরুয়া, মাথায় জটবাঁধা চুল।

যুবকটি এই নবোদ্ভিন্নযৌবনা রমণীকে দেখে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে জিজ্ঞেস করলো, হে অচেনা, তুমি কে?

রাজাব তখনও স্মরণে আছে যে তিনি পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁর শরীরটি নারীর। তিনি বললেন, আমি কেউ না!

যুবকটি বললো, তোমাকে দেখে আমার মনে তপোবন-বিরুদ্ধ এক অনু-ভূতি জাগছে। তুমি কি স্বপ্ন না মায়া? মতিভ্রম না তাবৎ জীবনের গুণফল?

নারীরূপিনী রাজা আবার বললেন, আমি কেউ না।

তখন সেই মুনিকুমার এগিয়ে এসে তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে রাজার জীবনে যেন এক অলৌকিক ব্যাপার হলো। জীবনে তিনি বহু নারীকে স্পর্শ কবেছেন, কিন্তু আজ তাঁর শরীরে এই পুরুষের স্পর্শে যে তরঙ্গ খেলে গেল, তেমনটি তো আগে কখনো হয় নি! তাঁর তীব্র ইচ্ছা হলো এই যুবা তাকে বক্ষে টেনে নিক। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ না করে একটু দূরে সরে গেলেন।

তরুণ ঋষি আবার কাছে এসে তাঁর বক্ষে হাত রাখতে যেতেই তিনি মুখ ফিরিয়ে বললেন, না!

তখন সেই কামার্ত যুবা মাটিতে হাটু গেড়ে বসে পড়ে বললেন, হে রূপসীশ্রেষ্ঠা, তোমাব নয়ন কাছে আহত। তোমার অধর সুধায় আমায় সঞ্জীবিত করো। আমার যাগ-যজ্ঞ সব জলাঞ্জলি যাক। আমি তোমাকে পেয়ে ধন্য হতে চাই।

আরও কিছুক্ষণ স্তব-স্তুতি শোনার পর নারীরাজা সম্মত হলেন।

তারপর তিনি পেলেন তাঁর জীবনের সবশ্রেষ্ঠ আনন্দ। রমকে এত সুখ তা তিনি জানতেন না। আগে মনে করতেন রতি সুখ মানে জয়ের আনন্দ। এতকাল তিনি ওপরে থাকবেন, আজ নিচে। পিঠের তলায়

যে মাটি কাঁপে, ওপরে আকাশও যে কাঁপে তা বোধহয় কোনো পুরুষই জানে না।

চরম উল্লাসে তিনি আঃ আঃ শব্দ করতে লাগলেন।

মুনি-কুমার তাঁর ক্রীড়া সাঙ্গ করা মাত্রই রমণী-রাজার ইচ্ছে হলো, আবার হোক, আবার হোক। এই যুবা তাকে পীড়ন করুক, দংশন করুক, তাকে স্বর্গ সুখ দিক।

সেই যুবা-ঋষিকেই বিয়ে করে রমণী-রাজা বনের মধ্যে পর্ণকুটিরে ঘর-সংসার করতে লাগলেন।

বেশ কয়েক বছর পর সেই রাজার প্রাক্তন রাজ্যের মন্ত্রী ও পাত্র মিত্রের দলবল সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে ঋষিপত্নীর সামনে সসম্মানে অভিবাদন করলেন।

মন্ত্রী বললেন, হে আত্মবিস্মৃত রাজা ভঙ্গস্বন, আমরা অতি কষ্টে আপনাকে খুঁজে পেয়েছি। ইন্দ্রের সঙ্গে আপনি একবার কলহ করেছিলেন, সেই জন্য ইন্দ্র আপনার মনে মোহ এনে দিয়ে আপনাকে নারীতে পরিণত করেছেন। আমরা যাগ যজ্ঞে ইন্দ্রকে তুষ্ট করেছি। ইন্দ্র আবার আপনাকে পূর্ব অবস্থা ফিরিয়ে দিতে রাজি হয়েছেন।

ঋষিপত্নীর সব কথা মনে পড়ে গেল। তিনি ফিক করে হাসলেন।

মন্ত্রী হাত জোড় করে বললেন, রথ প্রস্তুত, আপনি চলুন!

ঋষিপত্নী বললেন, পাগল নাকি! কোনো রমণী কখনো পুরুষ হতে চায়? হে মন্ত্রী, পৃথিবীর কোনো পুরুষ এতকাল ধরে যে গুপ্ত কথা জানতে পারে নি, আমি তা জেনেছি। পুরুষরা তো চতুর্দিক দাপিয়ে বেড়ায় কিন্তু প্রতি মুহূর্তে নারীদের কাছে এসে পরাভূত হয়। শরীরের যে কী আনন্দ তা পুরুষরা সঠিক ভাবে কোনোদিন টেরই পেলো না! আমি যেমন আছি, চমৎকার আছি। এই আনন্দের তুলনায় রাজপদ অতি তুচ্ছ। আপনারা ফিরে যান। আমার আগের ছেলেদের সিংহাসন দিন। আমার এই পক্ষের সন্তানদের প্রতি স্নেহ বেশি। তাদেব ছেড়েও কোথায় যেতে পারবো না!

বহুকাল পর! কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে ভীষ্ম যখন শরশয্যায় শুয়ে দক্ষিণায়নের প্রতীক্ষা করছিলেন, তখন যুধিষ্ঠির তাঁর কাছ থেকে অনেক জ্ঞানের কথা জেনে নিতে নিতে একবার প্রশ্ন করেছিলেন, আচ্ছা, পিতামহ, নারী ও পুরুষের মধ্যে যৌনসুখ কে বেশি পায়?
ভীষ্ম বললেন, তোমাকে আমি ভঙ্গস্বন রাজার উপাখ্যান শোনাচ্ছি!
কাহিনীটি শুরু করার আগে ভীষ্ম প্রথমে মৃদু হাস্য করলেন। মনে মনে ভাবলেন, তাঁর এই ধার্মিক নাতিটি সত্যিই বড় গো-বেচারা! কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছুই নেই। এই প্রশ্ন কি কেউ কোনো মৃত্যুপথযাত্রী জিতেন্দ্রিয় পুরুষকে করে?
তারপরই ভীষ্মের একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। যেন এক বায়ুময় হাহাকার! জিতেন্দ্রিয়? সাধারণ মানুষের চারগুণ লম্বা একটা জীবন কাটিয়ে গেলেন, তবু নারীর রহস্য কিছুই জানলেন না। ব্যর্থ, ব্যর্থ, সব ব্যর্থ!



তিনু ও তিন্নি

উঠোনে পা দিয়েই বলরাম উগ্র গলায় জিজ্ঞেস করলো, তিনু কোথা? তিনু? কোথায় গেল সেই ছোঁড়াটা?

তিনু এ বাড়ির যেখানে সেখানে থাকে। তার নিজস্ব কোনো জায়গা নেই, রাত্তিরে শোয় রান্নাঘরের বারান্দায়, অন্য সময় সে চতুর্দিকে ঘুরঘুর করে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। এ সময় সে বাড়ির বাইরে যায় না।

দু'তিনবার হাঁক দিয়েও তার সাড়া পাওয়া গেল না।

বাইরের ঘরে তক্তাপোশের ওপর হ্যারিকেনের আলোয় পড়তে বসছে শিবু আর গৌর, এই একটা ছুতো পেয়ে তারা পড়া ছেড়ে লাফিয়ে বেরিয়ে গিয়ে তিনু তিনু বলে চিৎকার করতে লাগলো।

তিনু গোয়ালঘরে নেই, রান্নাঘরের কাছাকাছি নেই, পুকুর ধারেও নেই। একটু আগেও সে ছিল! গৌর আর শিবু তাকে দেখেছে। কত্তা বাড়ি ফেরার সময় সে গেল কোথায়? নিশ্চয়ই আজ কিছু একটা কাণ্ড করেছে সে।

বলরাম বারান্দায় এসে চটি খুললো, ঘাড় ঘুরিয়ে বলতে লাগলো, কোথায় সে? কোথায়?

তাকে পাওয়া যাচ্ছে না শুনে জিজ্ঞেস করলো, গরু বেঁধেছে? বাড়ি ফিরেছিল?

হ্যাঁ, বাড়িতে সে ফিরেছে ঠিকই। গরুটাকে গোয়ালে তুলেছে, জাবনা

দিয়েছে, নিজেও ঢকঢক করে এক ঘটি জল খেলো, তারপর কোথায় গেল ?

বলরাম নিজের ঘরে গিয়ে ধুতি-পাঞ্জাবি ছেড়ে লুঙ্গি পরলো, তারপর পুকুরে গেল হাত-পা ধুতে। জল শুকিয়ে গেছে অনেকখানি, পুকুর এখন প্রায় একটা ডোবা। ঝিঁঝিঁ ডাকছে তেঁতুল গাছে। ওপারে মেজো জ্যাঠার বাড়িতে হ্যাজাক জ্বেলেছে, অনেক দূরে ঘেউ ঘেউ করছে কয়েকটা কুকুর।

ফিরে এসে বলরাম একটা ট্রানজিস্টার রেডিও খুলে বিড়ি ধরালো। হুঁকো তামাকের পাট তুলে দিতে হয়েছে কিছুদিন আগে, বিড়িতে কম খরচ পড়ে। সন্ধ্যের পর বাড়িতে ফিরে রেডিও শোনাই বলরামের অবসর-বিনোদন। বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে সে কথাবার্তা বিশেষ বলে না। গাম্ভীর্যই তার ব্যক্তিত্ব।

এমনই কপাল যে চার ছেলে-মেয়ের মধ্যে মেয়ে দুটোই জন্মেছে আগে। অর্থাৎ শুধু খরচ আর খরচ, পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই। এর মধ্যে আবার বড় মেয়েটি ফিরে এসেছে বিধবা হয়ে। তার বিয়ের জন্য যে জমি বিক্রি করতে হয়েছিল, তা আর ফিরে এলো না।

শুধু জমির চাষে আর সংসার চালানো যাবে না। এখন সকলেরই ঝোঁক পঞ্চায়েতের দিকে। ভোটে জিতে পঞ্চায়েতের মেম্বার হতে পারলে অনেক কিছুর সুরাহা হয়। বলরাম তাই কিছুদিন ধরে পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্টের কাছ ঘেঁষবার চেষ্টা করছে। সে রাজনীতি বোঝার চেষ্টা করে রেডিও শুনে শুনে। সে বুঝে গেছে যে রেডিওতে যা বলে, পঞ্চায়েত প্রেসিডেন্ট হারানবাবুর কাছে উল্টো সুর গাইতে হয়। ও শালারা সব মিথ্যে কথা বলে, একথাটা হারানবাবুর মুখে প্রায়ই শোনা যায়।

খানিকবাদে দামিনী এসে জিজ্ঞেস করলো, তিনু কী করেছে ?

বলরাম স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালো শুধু একবার। সে কোনো রকম ব্যাখ্যা কিংবা কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজন মনে করে না। হারানবাবুর বাগানে আম পাড়তে গিয়ে ধরা পড়েছিল তিনু। সেখানে প্রচণ্ড মার

খেয়েছে। হারানবাবুর শখের কলমের গাছের আম। তিনি নিজে শাস্তি দিয়েছেন তিনুকে। তাতে বলরামের কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু হারানবাবু জেনে গেছেন যে তিনু বলরামের বাড়িতে রাখালের কাজ করে।

এতে বলরামের ওপরেই তো সব দোষ পড়বে!

বলরাম বললো, সেটাকে পাওয়া গেল না? পালিয়েছে?

দামিনী বললো, এতক্ষণ তো ছিল না, এখন তো দেখলাম রান্নাঘরে বসে খাচ্ছে।

বলরাম সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। লুঙ্গির কষিতে শক্ত করে গিঁট বেঁধে ঘরের কোণ থেকে তুলে নিল একটা লাঠি। মজা দেখার জন্য শিবু আর গৌর আবার পড়া ছেড়ে ছুটলো বাবার পেছনে।

বিধবা মেয়ে নীতার ওপরেই এখন রান্নাবান্নার ভার। রাত্তিরে সে তিনু-কেই সবচেয়ে আগে খেতে দেয়। ওকে সব কিছু না দিলেও চলে। সন্ধ্যের পর থেকেই তিনুর পেট জ্বলে খিদেয়। নীতার কাছে এসে ঘ্যান ঘ্যান করে রোজ। এক কাঁড়ি ভাতের সঙ্গে একটু ডাল ও তরকারি দিলেই চলে, তরকারি না হলেও ক্ষতি নেই, তিনু ডাল-ভাতই চেটেপুটে খেয়ে নেবে।

রান্নাঘরের বারান্দায় বসে কলাইকরা থালায় ভাতের অর্ধেকটা তখন সবে শেষ করেছে তিনু। বলরামকে সদলবলে আসতে দেখেই সে কেঁপে উঠলো। ভয়ে আমসি হয়ে গেল মুখ, অবশ হয়ে গেল হাত।

বলরাম কাছে এসে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধ থেকে বুঝিয়ে দিলো নিজের মেজাজ। তারপর ধীর স্বরে বললো, খাওয়া শেষ কর!

দ্বিতীয়বার ধমকে তিনু আবার খাওয়া শুরু করলো এবং চার্লি চ্যাপলিনের ভঙ্গিতে নিমেষের মধ্যে ভাত শেষ করে ফেললো।

বলরাম বললো, হাত ধুয়ে আয়!

উঠোনের এক কোণে বড় বড় মাটির গামলায় তিনুই জল ভরে রাখে। চটপট আঁচিয়ে সে শরীর বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে মিনমিনে গলায় বললো, আর

করবো না। কোনোদিনও।

বলরাম লাঠি দিয়ে ঠিক এক ঘা মারলো তার পিঠে। খুব জোরে নয়। তার নিজের হাতে শাস্তি দেওয়া দরকার, তাই সে মেরেছে। তারপর বললো, এই দণ্ডে দূর হয়ে যা! যা, বেরিয়ে যা! কোনোদিন আর এমুখো আসবি না!

গোয়ালঘরের মধ্যে থাকে তিনুর জামা-কাপড়ের একটা পুঁটুলি। ঘরটা এতই ছোট যে আর ভেতরে দাঁড়াবার জায়গাও বিশেষ নেই। গরুটার নাম তিন্নি। এ নাম তিনুই রেখেছে। অনেকে বলে তিনু আর তিন্নি ভাই-বোন। শিবুরা বলে, তিনুটা আগের জন্মে গরু ছিল।

গোয়ালের মধ্যে ভনভন করছে মশা আর ডাঁশ। তিন্নি কান লটপট করে ডাঁশ তাড়াচ্ছে। তার মাথায় হাত দিয়ে তিনু ফিসফিস করে কী যেন বলতে গেল। দরজার কাছ থেকে বলরাম ধমক দিয়ে বললো, আদি-খ্যেতা করতে হবে না। বেরিয়ে আয়!

পুঁটুলিটা বুকে চেপে বেরিয়ে আসতেই বলরাম লাঠিটা উঁচিয়ে ধরে বললো, দূর হয়ে যা! আর কোনোদিন যেন তোর মুখ দেখতে না হয়!

তিনু একবার শুধু শিবুর মুখের দিকে তাকালো। শিবুর কাছে সে দুটো টাকা পায়। কিন্তু সে কথা এখন উচ্চারণ করলে সে বলরামের হাতে তো মার খাবেই, পরে শিবুও তাকে মারবে।

আর কোনো কথা না বলে সে বেরিয়ে গেল।

বলরাম সকলের দিকে এমনভাবে চোখ ঘোরালো যে তাতেই বুঝিয়ে দিলো, এই নিয়ে আর কোনো আলোচনার দরকার নেই।

মানুষের চরিত্র বোঝা বড় দুষ্কর। হারানবাবুকে খুশী করবার জন্য বলরাম তাড়িয়ে দিলো তিনুকে, অথচ সেই হারানবাবুই দু'দিন বাদে বললেন, ওহে বলরাম, তুমি নাকি তোমার বাড়ির রাখাল ছোঁড়াটাকে বিদেয় করে দিয়েছো? আরে, না, না! আমার গাছ থেকে সে দুটো আম ছিঁড়েছিল, সেজন্য আমি তাকে শাস্তি দিয়েছি। সেই তো যথেষ্ট! তুমি তাকে তাড়ালে, এখন সে খাবে কী? শুনলাম তো ছোঁড়াটার বাপ নেই,

মামারা খেতে দেয় না। এদের আমরা যদি একটু আধটু না দেখি, তা হলে আর কে দেখবে!

একটু থেমে আবার তিনি বললেন, ছোটবেলায় আমরাও কি অন্যের গাছ থেকে ফল-পাকড় চুরি করিনি দু-একবার? আসলে জানো কি ভায়া, দুরন্ত ডানপিটে ছেলেদের আমি পছন্দই করি। সেদিন হঠাৎ মাথায় রাগ চড়ে গিয়েছিল, আমগুলো এখনো পাকেনি, এ বছরেই প্রথম ফল এসেছে···

সুতরাং আবার ফিরিয়ে আনতে হলো তিনুকে। বাড়ি ফিবে বলরাম ব্যাজার মুখে বড় ছেলেকে বললো, যা, ছোঁড়াটাকে ডেকে নিয়ে আয়। শিবু মুচকি হাসলো। আসল মজার ব্যাপারটা বাবা জানে না। কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলেও তিনু এই ক'দিন রোজই মাঠে গিয়ে তিন্নির কাছে বসে থেকেছে। শিবু মাঠে গিয়ে গরুটাকে ছেড়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত। তিনু বিনে মাইনের, বিনে খোরাকির রাখালি করতেও রাজী। বলরামের ভয়ে সে এ বাড়িতে আর ঢোকে না, কিন্তু সন্ধ্যের আগে সে-ই তিন্নিকে বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়। তিন্নিকে ছেড়ে সে একদিনও থাকতে পারে না, ভাই-বোন যে!

খবর পেতেই তিনু তার পুঁটুলিটা বগলে নিয়ে লাফাতে লাফাতে চলে এলো। রান্নাঘরেব বারান্দায় উঠে বললো, ও নীতাদি, ভাত দাও, ভাত দাও!

যেন কিছুই হয়নি এই কটা দিন!

রাত্তিরবেলা শিবু একবার পেচ্ছাব করতে বেরিয়ে এসে শুনতে পায়, তিনু গোয়ালঘরের মধ্যে বসে গরুটার সঙ্গে কী সব বকবক করে চলেছে।

অনেকেই জানে, তিনু মাঠে সারাদিন তার গরুর সঙ্গে কথা বলে। বাছুরটা মারা যাওয়ায় ইদানিং দুধ দেওয়া বন্ধ করেছে তিন্নি, রোগাও হয়ে গেছে বেশ। বলরাম এক একবার গরুটা বিক্রি করে দেবার কথা ভাবে। তাতে অবশ্য দামিনীর খুবই আপত্তি। কিন্তু গরু পোষার খরচও তো কম নয়। শুধু ঘাস খাওয়ালে চলে না, তেমন ঘাসই বা কোথায়?

রাখালের দু'বেলার খোরাকি আর পনেরো টাকা মাইনেও তো আছে। তিনু এখন তিন্নিকে অনেকটা দূরে নদীর ধার পর্যন্ত নিয়ে যায়। সেখানে কিছু বিন্নি ঘাস আছে। অন্যের জমি থেকে চুপি চুপি ছিঁড়ে আনে কচি ধান। তিন্নির মুখের কাছে এনে বলে, খা, খা তাড়াতাড়ি খেয়ে নে! তিন্নি মুখ দিয়ে ফ-র-র-র শব্দ করতেই তিনু তার গলকম্বলে আদর করতে করতে বলে, ধানের মধ্যে দুধ আছে। খুব মিষ্টি না?

তিনু কখনো দূরে চলে গেলে গরুটা মুখ তুলে হাম্বা রব তোলে। সত্যিই যেন সে তিনুকে ডাকে। এক এক সময় গাছের ছায়ায় গরুটার পাশে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে তিনু, গল্প শোনাতে শোনাতে হঠাৎ হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, বুঝলি তো? গরুটা কান লটপটিয়ে জানিয়ে দেয়, বুঝেছি। প্রতিদিনের জীবন থেকে অনেক গল্প খুঁজে পায় তিনু, কিন্তু শোনবার জন্য শুধু রয়েছে তিন্নি।

হারানবাবু একদিন মটোর সাইকেলে আসতে আসতে নদীর ধারে থেমে গেলেন। সদ্য মটোর সাইকেল কিনেছেন তিনি। প্রায়ই এটা নিয়ে দাবড়ে বেড়ান। গোটা পঞ্চায়েত এলাকায় ঘুরতে তিনি যেন জমিদারি পরিদর্শনের সুখ পান। আগে ছিলেন প্রাইমারি স্কুলের কেরানী, এখন সে কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। পার্টি তাঁকে মদত দিচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে এম এল এ হবার আশা আছে।

পাকুড় গাছের নীচে বসে বসে জাবর কাটছে একটা গরু আর তার পাশে আছে একটি কিশোর। ছেলেটিকে চিনতে পারলেন তিনি। তাঁর সাধের গাছের দুটো আম চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল বলে খুবই রেগে গিয়েছিলেন সেদিন। বিশেষ করে কাঁচা আম ছিঁড়েছিল বলেই অত রাগ। কলমের গাছের প্রথম ফল, গোটা আষ্টেক মোটে ফলেছিল। মারতে মারতে ছেলেটাকে তিনি মাটিতে শুইয়ে ফেলেছিলেন।

সেজন্য আজ হারানবাবুর অনুতাপ হলো। ছেলেটার জন্য কিছু একটা করা দরকার। তিনি ডাকলেন, এই, এদিকে শোন।

বছর সতেরো বয়েস। চেহারাটা মন্দ না। হারানবাবু তার আপাদমস্তক

চোখ বুলিয়ে দেখে বুঝলেন যে হাত পায়ের গড়ন ভালো, মুখেও একটু শ্রী আছে, ভালো করে খাওয়ালে-দাওয়ালে তরতরিয়ে জোয়ান হয়ে যাবে। পড়ন্ত চাষী পরিবারে রাখালের কাজ করে। এ দেশের ভবিষ্যৎ কী? এরপর বড় জোর খেত মজুর হবে! বাবা নেই, ওর মা থাকে মামাদের কাছে, তারও নাকি শরীরে কী অসুখ বাসা বেঁধেছে, কোনো কাজ করতে পারে না, সুতরাং মামারাই বা ওকে শুধু শুধু খেতে পরতে দেবে কেন? আজকাল কেউ দেয়?

ছেলেটার জন্য কিছু একটা করা দরকার। হাত-পাগুলো আর একটু শক্ত হলে এ ছেলে একদিন লাঠি ধরতে পারবে। লাঠি ধরতে না শিখলে কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

তিনুর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে তিনি আবার মটোর সাইকেল হাঁকিয়ে রওনা দিলেন। বলরামকে ডেকে পাঠালেন পরের দিন।

প্রস্তাব শুনে বলরাম সঙ্গে সঙ্গে রাজী।

হারানবাবুর মেয়ে-জামাই থাকে বর্ধমানে। জামাই সর্বক্ষণ রাজনীতি করে, রীতিমতন একজন পাণ্ডা। বিরোধীপক্ষের ছেলেরা তাকে একবার মারার চেষ্টা করেছিল। তাই সে সব সময় দলবল নিয়ে ঘোরে।

সেই মেয়ে-জামাইয়ের কাছে তিনুকে পাঠাতে চান হারানবাবু। আজকাল কাজের লোক পাওয়া খুব মুশকিল। গ্রাম থেকে একটা ছেলেকে পাঠাবার জন্য মেয়ে অনেকবার অনুরোধ জানিয়েছে বাবাকে। এ ছেলেটা বর্ধমানে গিয়ে কিছুদিন ফাই-ফরমাস খাটুক। তারপর আর একটু বয়েস বাড়লে জামাই ওকে বডিগার্ড করে নিতে পারবে! বর্ধমানে গেলে ওর রোজগার হবে অনেক বেশি, অসুস্থ মায়ের জন্য টাকা পাঠাতে পারবে নিয়মিত, নিজেরও একটা সুরাহা হবে। শুধু শুধু এখানে রাখালি করে মরতে যাবে কেন?

হারানবাবু এ প্রস্তাবটা শোনালেন আরও পাঁচজনের সামনে। প্রত্যেকেই বললো, ঐ রাখাল ছোঁড়ার জন্য এমন ভালো ব্যবস্থা আর হতে পারে না। হারানবাবুর দয়াতেই ছেলেটার একটা হিল্লে হবে।

বলরাম বললো, আমিও গরুটাকে বেচে দেবার কথাই ভাবছিলাম। তখন আর ওকে রাখতামই বা কী করে?

মার খেয়েও কক্ষণো কাঁদে না তিনু। কিন্তু এবার সে বলরামের পা জড়িয়ে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলো। বলরামের কাছ থেকে সে দামিনীর পায়ে মাথা কোটে। দামিনীর মনটা একটু নরম, অভাবের সংসারে নিজেদের যেমন চলে যাচ্ছে কোনোক্রমে, এ ছেলেটারও একটা পেট চলে যেত। গরু দেখা ছাড়াও আরও অনেক কাজ করে। এরপর তিন্নিকে দেখবে কে?

বলরাম অনড়। হারানবাবুকে সে খুশী করতে চায় তো বটেই, তা ছাড়াও আর গরু পোষার দম তার নেই। পঞ্চায়েতে ঢুকতে পারলে যদি কিছু অবস্থা ফেরে, তখন না হয় আবার গরু কেনা যাবে!

দামিনী বললো, ছেলেটা তিন্নিকে বড়ো ভালোবাসে!

বলরাম ধমক দিয়ে বললো, ন্যাকামি করো না! মানুষের ভালবাসারই এখন কোনো দাম নেই তো গরু!

পালিয়ে গিয়েও নিষ্কৃতি পেলো না তিনু। হারনবাবুর প্রচুর লোকবল, তারা বেড়াজালের মতন ঘিরে তিনুকে ছেকে তুললো। তিনুকে যেতেই হবে।

তিনু দুঃখের কথা আর কাকেই বা বলবে, তিন্নিকে ছাড়া? তার মা, তার মামারা, এ বাড়ির লোকেরা সবাই চায় সে কোন্ অচেনা দূর জায়গায় চলে যাক। সে এখানে বেশ ছিল, তার তো কোনো অভাব ছিল না! সে আর কারুর বাগান থেকে ফলও চুরি করেনি, তবু কেন তার এই শাস্তি!

গভীর রাতে গোয়ালঘরে ঢুকে তিন্নির গায়ে হাত বুলোতে গিয়ে সে কেঁদে ফেললো। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলতে লাগলো ওরে তিন্নি, আমি চলে যাচ্ছি! তুই একা থাকতে পারবি?

আজ আর তিন্নি ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাসও ফেলছে না, কানও লটপট করছে না। মুখ ফিরিয়ে তাকালোও না একবার।

একটু বাদে তিনু খেয়াল করলো যে তিন্নি তার কথা শুনছে না, ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরদিন সকালে শিবু মাঠে নিয়ে গেল তিন্নিকে, তিন্নি একটুও আপত্তি করলো না। তা হলে সে কি কিছুই বুঝতে পারছে না। তিনু তার পিছু পিছু গেল খানিকটা, শিবু তাড়া দিয়ে বললো, এই, তুই আসছিস যে! তোকে তৈরী হতে হবে না?

সকাল নটার মধ্যে হারানবাবুর ভাই সনাতন এসে হাজির হলো। সে তিনুকে পৌঁছে দেবে বর্ধমান। এখান থেকে মাইল তিনেক হাঁটা পথ, তারপর বাস রাস্তা। হারানবাবু এক সেট জামা-প্যাণ্ট পাঠিয়েছেন ওর জন্য।

গ্রামের প্রান্ত ছেড়ে দূরে চলে যাচ্ছে তিনু আর বারবার পিছু ফিরে তাকাচ্ছে। তিন্নি কি কিছুই বুঝলো না? এতদিন ধরে সে যত গল্প বলছে, তাও শোনেনি? এর আগে তিন্নি কতবার তাকে ডেকেছে, তার গায়ে মাথা ঘষে আদর করেছে।

একটু পরে তিন্নির নিশ্চয়ই খেয়াল হবে। তার বদলে শিবু। তিনুকে ছেড়ে তিন্নি একদিনও থাকেনি।

হঠাৎ মনে পড়লো, তিন্নি ছুটে আসছে তার দিকে। দূরের রাস্তায় ধুলো উড়ছে। তার মধ্যে দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে কে? আসছে, আসছে, তিন্নিই আসছে তার জন্য।

তিনু দাঁড়িয়ে পড়তেই সনাতন তার হাত চেপে ধরলো। জোর করে হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে তিনু চেঁচিয়ে উঠলো, তিন্নি!

ধুলোর ঝড়ের মধ্যে বিরাট আওয়াজ তুলে ছুটে এলো একটা লরি। তার ওপরে গাদাগাদি করা দশ বারোটা গরু বাঁধা। ওদের মধ্যে তিন্নি আছে কিনা তা চেনবার আগেই লরিটা তিনুকে ছাড়িয়ে পার হয়ে গেল।

মৃত্যুদন্ড

অনেকের কাছে মনে হবে, লোকটির অপরাধ অতি সামান্য। কিন্তু রাগে আমার গা জ্বলে গিয়েছিল!

ট্রেনে যাচ্ছিলাম হাজারিবাগ। রাত্তিরের ট্রেন, তেমন কিছু ভিড় নেই। কামরাটি মোটামুটি পরিচ্ছন্ন, আলোর জোর আছে। বই পড়া যাবে, সুতরাং যাত্রাটা বেশ আরামদায়কই হবার কথা।

ট্রেন ছাড়ার আগে একটা ব্যাপার নিয়ে গোলমাল চলেছিল খানিকক্ষণ, ওপরের মালপত্র রাখবার জায়গায় একজন যাত্রী এক গাদা কাপড়ের গাঁঠরি রেখে সব জায়গাটা ভরে ফেলেছে। অন্য যাত্রীরা নিজেদের মালপত্র রাখার একটুও জায়গা পাচ্ছে না। একজন লোক এত বেশি মালপত্র এনে এতখানি জায়গা দখল করবে কেন? এই নিয়ে কয়েকজন রাগারাগি করতে লাগলো।

সেই যাত্রীটি ধুতি ও সাদা শার্ট পরা। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, সে এক-গুঁয়ের মতন একটা মালও নামালো না, বারবার হিন্দীতে বলতে লাগলো, আমি আগে এসেছি, মালপত্র রাখার জায়গায় কি রিজার্ভেশন থাকে?

কেউ কেউ পাল্টা যুক্তি দিয়ে বললে বেশি মালপত্র থাকলে লাগেজ ভ্যানে বুক করা নিয়ম। কিন্তু লোকটি এসব কথায় কানই দিলো না।

লোকটিকে দেখলে মনে হয়, ছোট খাটো কাপড় ব্যবসায়ী, গাঁঠরি-গুলোতে সে ধুতি শাড়ি নিয়ে চলেছে।

আমি একা, সঙ্গে ছোট একটা ব্যাগ, সেটা সীটের নিচেই রাখা যায়, আমার কোনো অসুবিধে হয় নি।

সুতরাং আমি ঐ ঝগড়ার মধ্যে মাথা না গলিয়ে চুপচাপ শুনে চললাম।

ট্রেন চলতে শুরু করতেই অবশ্য আস্তে আস্তে সব থেমে গেল। অন্যদের সুটকেস বেডিং কোনো রকমে অন্য জায়গায় ঠেসে ঠুসে দেওয়া হলো। ছ'একজন একটুক্ষণ রাগে গরগর করে কয়েকটা বাঁকা বাঁকা কথা বললো। কিন্তু সেসব ঐ গাঁঠরিওয়ালার গায়ে বিঁধেছে বলে মনে হলো না।

বেশ ঝলমলে রঙের ছাপা শাড়ি পরা এক মহিলা জানলার ধারে বসে আগাগোড়া তাকিয়েছিল বাইরের দিকে, ঝগড়ার সময় একবারও মুখ ফেরায় নি। তার উল্টো দিকের জানলার পাশেই বসেছে কাপড়ের ব্যবসায়ীটি। কিছুক্ষণ বাদে ঝুঁকে পড়ে সে মহিলাটির সঙ্গে কিছু একটা কথা বলতেই বোঝা গেল, ওরা স্বামী-স্ত্রী।

আগে ভাগে স্টেশনে এসে ওরা শুধু ওপরের তাকে মালপত্র বোঝাই করেনি, ভালো ভালো ছটি বসবার জায়গাও দখল করেছে।

যখনকার কথা বলছি, তখন সেকেণ্ড ক্লাসকে বলা হতো থার্ড ক্লাস। সেই থার্ড ক্লাসের বেশ কিছু কামরায় সীট রির্জাভেশনের কোনো বালাই ছিল না। যার যেমন খুশী বসে পড়তো। কেউ কেউ বিছানা পেতে ফেলে অনেকটা জায়গা নিয়ে নিত।

মহিলাটির মাথায় ঘোমটা দেওয়া। সর্বাঙ্গে ঢাকাঢুকি দেওয়া থাকলেও বোঝা যায় শরীরের গড়নটি বেশ ভালো।

আমি বসেছি তার ঠিক পাশেই। মহিলাটির মুখ দেখার জন্য যে-কোনো পুরুষেরই কৌতূহল হবে।

দেখাও গেল। ঘি-এর মতন রং, টানা টানা চোখ, নাকটিও চোখা। সুন্দরীই বলা যায়। খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা কাপড়ের ব্যবসায়ীটির স্ত্রী একেবারেই মানায় না।

তবে, মহিলাটির নাকে একটা বড় নোলক, চুল তেল জবজবে, মুখ থেকে গ্রাম্যতার ছাপ একটুও মোছে নি। হয়তো বিহারের কোনো প্রত্যন্ত

গ্রামের মেয়ে, কিংবা উত্তর প্রদেশের। এই সব গ্রামের কোনো মেয়ে যদি হঠাৎ খুব সুন্দরী হয়ে যায়, তাহলে শহরের কেউ না কেউ টাকার জোর দেখিয়ে তাকে বিয়ে করে নিয়ে যাবেই।

কোনো ভালো জিনিসই গ্রামের জন্য নয়। গ্রামের ভালো ভালো তরি-তরকারি মাছ মুরগী যেমন শহরে চালান হয়ে যায়, তেমনি সুন্দরী মেয়েরাও চালান হয়ে যাবে, এতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে?

কাপড়ের ব্যবসায়ীটি অত কাপড় সঙ্গে নিয়ে চলেছে, কিন্তু নিজের পোশাক বেশ মলিন। বউটির শাড়িটি খুব দামি নাহলেও তার রঙের উজ্জ্বলতা চোখ টানে। তার গায়ের রঙের সঙ্গে বেশ মানিয়েছে।

কিছুক্ষণ বাদে স্বামীর নির্দেশে বউটি তার পাশ থেকে একটা পুঁটলি বার করে সেটা খুললো।

আমি যদিও একটা বই খুলে পড়ছি, কিন্তু মাঝে মাঝে পাশের দিকে চোখ চলে যাচ্ছে। বইটি বেশ কঠিন, জেমস জয়েসের ইউলিসিস। আগে যতবার পড়তে শুরু করেছি, শেষ করতে পারি নি। তাই সেবারে ঠিক করেছিলাম, সঙ্গে আর কোনো বই রাখবো না। যাওয়া আসার ট্রেন যাত্রায় বইটি শেষ করতেই হবে। কোনো একটা বই, ভালো জেনেও অর্ধসমাপ্ত রাখা তো কাপুরুষতা।

তখন আমার বয়েস সাতাশ। পাশে একজন সুন্দরী রমনী বসে থাকলে নিরস ছাপার অক্ষরের দিকে বেশিক্ষণ মনঃসংযোগ রক্ষা করা সম্ভব নয়।

পুঁটুলির মধ্যে একটা বড় সাইজের টিফিন কৌটো। তাতে রয়েছে দিস্তে-খানেক পরোটা, কালো কালো রঙের কী একটা তরকারি, অনেকখানি আচার আর গোটা কয়েক লাড্ডু।

মাত্র সাড়ে সাতটা বাজে, এরা এরই মধ্যে খাওয়া শুরু করেছে।

আমার ও কামরার অনেকের কাছ থেকে রেলের কেটারার খাবারের অর্ডার নিয়ে গেছে। আমাদের খাবার দেবে আসানসোলে। সওয়া নটায়। তার আগে রাত্তিরের খাওয়া আমার অভ্যেস নেই।

ওরা স্বামী স্ত্রী দিব্যি তৃপ্তি করে খাচ্ছে। মাঝে মাঝে ফিসফিস করে অতি

দুর্বোধ্য হিন্দীতে কী সব বলছে, তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না।
বউটি দু' একবার তাকালো আমার দিকে।
আমার মনে হলো, ওরা বোধহয় ওদের খাবার থেকে আমাকে কিছুটা দিতে চায়। সহযাত্রীদের প্রতি অনেকেই এরকম ভদ্রতা করে।
আমি জোর করে বইয়ে চোখ সেঁটে রইলাম। অন্যের খাবারের দিকে তাকানো মোটেই ভদ্রতাসম্মত নয়। ওরা আমাকে কিছু দিতে চাইলেই আমি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করবো। অন্যের খাবারে ভাগ বসাতে যাবো কেন? তাছাড়া ঠাণ্ডা পরোটা কিংবা লাড্ডু আমার একেবারেই পছন্দ নয়।
কিন্তু ঐ খাবারের দিকে তাকিয়েই আমার জিভে জল এসে গেছে। গ্রামের লোকদের আমের ঝাল ঝাল আচার অতি চমৎকার যে। আচার দেখলে আমি কিছুতেই লোভ সামলাতে পারি না। ওরা যদি খুব পীড়াপীড়ি করে তা হলে খানিকটা খাবারের সঙ্গে এক টুকরো পরোটা আমি চেখে দেখতে পারি। কিংবা শুধু খাবার।
শেষ পর্যন্ত ওরা অনুরোধ করলোই না। সব খাবার চেটে পুটে খেয়ে শেষ করলেন দু'জনে।
বউটি বর্তন ধোওয়ার জন্য চলে গেল বাথরুমের দিকে।
এতে আমার মনে একটা ক্ষোভ জন্মানো স্বাভাবিক। আমাকে পরোটা লাড্ডু প্রত্যাখানের সুযোগও দিলো না! কিংবা, ওদের আচার চোখে দেখে কত প্রশংসা করতাম, তা থেকে ওরা বঞ্চিত হলো!
অন্য কোনো লোকের সঙ্গে ভাব জমাবার ওদের কোনো ইচ্ছেই নেই। তার জন্য ওদের দোষ দেওয়া যায় না। প্রথমেই কামরার কিছু লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে এখন ওরা কোন-ঠাসার মতন আচারণ করতেই পারে। কিংবা হয়তো ওদের নতুন বিয়ে হয়েছে, নিজেদের নিয়ে মত্ত থাকতে চায়।
বউটির সঙ্গে স্বামীটির বয়সের অনেক তফাৎ, স্বামীটির বয়েস অন্তত ডবল। প্রৌঢ়স্য তরুণী ভার্যা। কাপড়ের ব্যবসায়ীটি নির্ঘাৎ টাকার

জোরেই তরুণীটিকে বিয়ে করেছে। গ্রামে তো এরকম হয়ই।

কিছুক্ষণ বাদে আমাদের কামরায় উঠলো একজন ভিখিরি-গায়ক। রাত্তিরের দিকে সাধারণত ভিখিরির উৎপাত কম থাকে। অনেকে ট্রেনে ওঠার পর থেকেই ঘুমের উদ্যোগ করে। এসময় ভিখিরিরা পাত্তা পায় না।

কিন্তু এই ভিখিরিটির বয়েস কুড়ি-একুশ, খালি-গা, মালকোচা মেরে ধুতি পরা। হাতে একটা বাঁশি। ঠিক যেন রাখাল-বেশী কেষ্টঠাকুর।

উঠেই ছেলেটি একটি গান ধরলো। পরিষ্কার, চাঁছাছোলা গান। গলায় তেজ আর সুর দুটোই আছে। ছেলেটি যেন জানে, ওর গান শুনলে কেউ আপত্তি জানাতে পারবে না।

তখন আর ছেলেটি ভিখিরি রইলো না।

সে একজন গায়ক। রেডিও বা রেকর্ড কোম্পানী তাকে চেনে না। পাড়ার জলসায় সে ডাক পাবে না। সেই জন্য সে ট্রেন যাত্রীদের গান শোনাচ্ছে। গান গাওয়াটাই তার জীবিকা। গানের পরে সে যখন লোকের কাছে পয়সা চাইবে, সেটা ভিক্ষে নয়, সেটা তার পারিশ্রমিক।

পর পর তিনটে গান শোনালো ছেলেটি।

সত্যিই সে ভালো গায়। চলন্ত ট্রেনে খুব চেঁচিয়ে গাইতে হয় বলে অনেকেরই গলা ভেঙে যায়। এর এখনও ভাঙে নি। অল্প বয়েস।

তিনখানা গান গেয়ে সে যখন থামলো, তখন কেউ কেউ তাকে আরও দু' একটা গানের ফরমায়েস করলো।

ছেলেটির কোনো আপত্তি নেই। যে যা বলে, সে গেয়ে দেয়।

কাপড় ব্যবসায়ীটিও একটা বিশেষ হিন্দী গান গাইবার মতো অনুরোধ করে বসলো।

কাপড়ের ব্যবসায়ীটি যে গান-বাজনার সমঝদার তা তো তার চেহারা দেখে বোঝা যায় নি!

দিব্যি তাল দিতে লাগলো মাথা নেড়ে। একটা গান শেষ হবার পর অনুরোধ জানালো আর একটার জন্য। সেটা শুনতে শুনতে যেন আবেশে

বুঁজে গেল তার চোখ।

এতগুলো গান গাইবার পর ছেলেটি হাত পাতলো অন্যদের সামনে। অনেকেই কিছু কিছু দিলো। আমি তখন কাঠ-বেকার, আমি সাধ্যের অতিরিক্ত দুটি টাকা দিলাম তাকে। ছেলেটিস ত্যিই ভালো গেয়েছে। কাপড়ের ব্যবসায়ীটি যে চোখ বুঁজেছে, চোখ আর খোলেই না। ছেলেটি তার সামনে হাতের পয়সা ঝনঝন করলো, দু'তিনবার দাদা, দাদা বলে ডাকলো, তাতে কোনো সাড়া নেই। লোকটি এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে, এটা অসম্ভব। মটকা মেরে আছে। একটাও পয়সা দেবে না।

ছেলেটি কিছু না পেয়েই চলে গেল।

আমি স্তম্ভিত!

গান শুনেও অনেকে পয়সা দেয় না, তা ঠিক। কেউ কেউ ভিখিরী বা কোনো কারুকেই পয়সা দেয় না, সেটাও তাদেব ব্যক্তিস্বাধীনতার ব্যাপার। কিন্তু এই লোকটা গান শোনার জন্য অনুরোধ জানালো কেন? তাও কিছু দক্ষিণা দেবে না গায়ককে? লোকটা মহা ফেরেববাজ তো। এরকম লোক আমি দেখিনি। কেমন যেন গা ঘিন ঘিন করতে লাগলো আমার। মানুষ এমন হীন হয় কেন? কাপড়ের ব্যবসা করছে, ঐ ছেলেটিকে কি অন্তত একটা আধুলিও দিতে পারতো না?

আমার খুব রাগ হচ্ছে বটে কিন্তু তা নিষ্ফলা রাগ। কেউ যদি ভিখিরীকে ভিক্ষে না দেয় কিংবা কারুর গান শুনেও পয়সা দিতে না চায়, তার জন্য কোনো অভিযোগ জানানো যায় না। জোর করে ওকে দিয়ে পয়সা দেওয়ানোও যায় না।

গুম মেরে বইতে চোখ ফেরালাম।

কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ। অনেকেই ঘুমে মন দিয়েছে। নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে কামরা। আমার চোখে ঘুম নেই।

হঠাৎ আমার কাঁধে কেউ রূঢ় ভাবে একটা ধাক্কা দিলো।

সেই কাপড় ব্যবসায়ী। সে বেশ অভদ্র ভাবে বসলো, আপ জেরা হট্

যাইয়ে!

লোকটির স্ত্রী ঘুমের ঘোরে আমার কাঁধে দু'একবার মাথা ছুঁইয়েছে। আমি একটু একটু সরে সরে বসলেও এ পাশে আর জায়গা নেই। ওকে ঘুম থেকে জাগিয়েও দেওয়া যায় না। ঘোমটাপরা একটা মাথা দু'একবার আবার কাঁধে লাগালেও মহাভারত এমন কিছু অশুদ্ধ হয়ে যায় না।

আমি কটমট করে লোকটার দিকে তাকালাম।

লোকটি এর পরেও বললো, আপ ইধার উঠকে আইয়ে!

ইচ্ছে হলো ঠাস করে ওর গালে একটা চড় কষিয়ে দিই।

কিন্তু কিছু একটা গোলমাল করলে আমারও বিপদ হবে, যদি লোকটা দুম করে বলে বসে যে আমি ওর যুবতী বউয়ের গায়ে ইচ্ছে করে হাত দিয়েছি?

আমার প্রতিবাদ কেউ বিশ্বাস করবে না। মেয়েদের দিকেই সকলের সহানুভূতি থাকে। আমার বয়সটাই দায়ী হবে।

লোকটি আবার ঐ কথা বলতেই আমি উঠে দাঁড়ালাম, অন্য কেউ যেন কিছু শুনতে পায়। জায়গা বদলা বদলি করলাম লোকটার সঙ্গে।

অপমানে আমার গা শিরশির করছে। কোনো দোষ করি নি, তবু লোকটা আমার সম্বন্ধে বিশ্রী সন্দেহ করেছে।

লোকটা এখনো তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ও শুধু একটা স্বার্থপর, কৃপণ চশমখোরই নয়, অতিশয় সন্দেহ প্রবণ, অভদ্র, অনেক কিছু।

আমি বললাম, হারামজাদা! যদি আমার একটা রিভলভার থাকতো, তোকে গুলি করে মেরে ফেলতাম। তোর মতন মরকের কীটের বেঁচে থাকার দরকার কী?

মনে মনে! মনে মনে ছাড়া আর কী? কোনোদিনই আমার কাছে রিভলভার থাকবে না। দৈবাৎ কখনো হাতে নিলেও গুলি করতে পারবো না। যারা অনায়াসে মানুষ মারতে পারে, তাদের মনের গঠনটাই অন্য রকম হয়।

আমি শুধু মনে মনেই এ রকম গজরাতে গজরাতে বহু লোককে শাস্তি দিই।

কিছুতেই জেম্‌স জয়েসে আর মন বসলো না। এক সময় ঘুম এসে গেল। বই খসে পড়ে গেল হাত থেকে।

শেষ রাতের দিকে ঘুম ভাঙলো আবার। ট্রেন থেমে আছে কোনো একটা বড়ো স্টেশনে বোধহয় ধানবাদ।

সেই কাপড়ের ব্যবসায়ী ও তার স্ত্রী নেমে যাচ্ছে এখানে। কুলি এসে নামাচ্ছে কাপড়ের গাঁঠরিগুলো। আমি ভাবলাম, যাক, আপদ বিদায় হলো।

ঘোমটা দেওয়া বউটি যাবার আগে এক ঝলক তাকালো আমার দিকে। সেই দৃষ্টিতে কিছু একটা ছিল। হয়তো সে তার স্বামীর দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইছে। কিন্তু মুখে কিছু বললো না, কী করে এসব কথা বলতে হয়, তা জানে না।

ঐ দৃষ্টিটার জন্যই মেয়েটির মুখ আমার মনে গেঁথে গেল।

দিন তিনেক বাদে ফিরলাম হাজারিবাগ থেকে। ঐ একই ট্রেনে।

ট্রেন ধানবাদ স্টেশনে অনেকক্ষণ দাঁড়ায়।

প্ল্যাটফর্মে এক জায়গায় ছোটখাটো একটা ভিড়। সেখানে কেউ চিৎকার করছে, অন্যরাও গলা মিলিয়েছে তার সঙ্গে। প্রথমেই মনে হয়, কারুর কোনো জিনিস চুরি গেছে। এ রকম তো প্রায়ই হয়।

নেমে উঁকি মেরে দেখি, কান্নাকাটি করছে একজন মহিলা। সাদা শাড়ি পরা। মাথায় ঘোমটা নেই, সব চুল খোলা।

ভিড়ের একজনের দিকে তাকাতেই সে বললো, ও বেচারার স্বামী কাল হঠাৎ মরে গেছে। হার্ট ফেল। বেচারার আর কেউ নেই এখানে!

আমার বুকের মধ্যে যেন একটা গুলি লাগলো।

এখন মুখখানা অন্য রকম দেখালেও এ যে সেই কাপড়ের ব্যবসায়ীর স্ত্রী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই!

বউটি একবার চোখ তুলে আমাকে দেখেই যেন থেমে গেল কয়েক

মুহূর্তের জন্য।
ধরা পড়া চোরের মতন ভয়ে কেঁপে উঠলাম আমি। আমাকে চিনতে পেরেছে? ও কী বুঝতে পেরেছে যে আমিই ওর স্বামীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলাম!
ওর স্বামীটি ছিল নিতান্তই চুনোপুঁটি। ওর অপরাধ এমন কিছু গুরুতর নয়। আমি কি সত্যি সত্যি ওকে মারতে চেয়েছিলাম? আরও কতো বড়ো বড়ো রাঘব বোয়াল কতো রকম জঘন্য অন্যায় করে দাপটে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কতো সময় আমি মনে মনে তাদের কঠোর শাস্তি দিই, কিন্তু তাদের তো কিছু হয় না!
দ্রুত পালিয়ে গেলাম সেখান থেকে। যেন আমারই একটা কঠিন শাস্তি প্রাপ্য।



ঘড়ি

আমার হাত ঘড়িটা কে চুরি করেছে, আমি জানি না। বেশী রাত্তিরে বাড়ি ফিরছিলাম চোখে একটু ঘোর ছিল, দোতলা বাসে জানালার পাশে বসতে পাওয়া তো বিরাট সৌভাগ্য, সেইসঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়া—ঘুম আসবে, তাতে আশ্চর্য কি! তাছাড়া বাসে ঘড়ি পরে ঘুমানো তো অন্যায় নয়। ঘুম ভাঙলো যখন অন্ধকার, বাস ডিপোতে এসেছে। খারাপ লাগলো না, একটা সিগারেট ধরালাম। বাসে বসে সিগারেট টানাও তো বেশ মজার। সময় দেখতে গিয়ে টের পেলাম আমার কব্জীতে কোনো বন্ধন নেই। ঘড়িটা কেউ খুলে নিয়ে গ্যাছে।

নেমে এলাম, কিছু কিছু কণ্ডাকটর, ডিপোর ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ড বিভাগের লোক কিছু ছিল, বেশ চেঁচামেচি করলাম, পৃথিবীর সবাইকে চোর বললাম। একজন বললো, আমার হাতে কোনো ঘড়িই ছিল না, ওটা আমার ভুল ধারণা। কিন্তু আমার লোমশ হাতে ঘড়ি পরার ফলে একটা দাগ হয়ে আছে, সেই হাত ওদের মুখের সামনে তুলে ধরলাম।—আপনার ঘড়ির নাম কি?

—ঘড়ির আবার নাম থাকে নাকি?

—থাকে না? কোন কোম্পানির ঘড়ি?

আশ্চর্য, কোনো ঘড়ির কোম্পানির নাম সেই মুহূর্তে আমার মনে পড়লো না। নাইজিরিয়ার প্রেসিডেণ্টের নামও আমার মনে আছে, কিন্তু ঘড়ির

নাম মনে নেই। নতমুখে চলে এলাম।

ঘড়িটা হারিয়ে আমি খুশীই হয়েছি বলা যায়। আমি একধরনের সময়ের বিড়ম্বনা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি। শরীর মন সবই এখন হালকা। তবে রাস্তা ঘাটে অন্য কারুর হাতে ঘড়ি দেখলেই আমি আড়চোখে তাকাই। এদের যে কেউ একজন আমার হাতঘড়িটা পরেছে হয়তো। হয়তো সবাই চোর নয়, কিন্তু চোরাই জিনিষ, সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড কিনতে তো কারুর আটকায় না। আমি মনে মনে বলি, বুঝবে মজা, আমার ঘড়ি হাতে দেবার ফলে সময় তোমাকে চরকি বাজিতে ঘোরাবে!

তারপর একদিন, একটা—রেঁস্তোরায় ঘণ্টাখানেক বসার পর বাথরুমে গেছি ঢুকেই দেখি মাটিতে একটা ঘড়ি পড়ে আছে। কি সাংঘাতিক সেটা, সবুজ ডায়াল, লেখাগুলো জ্বলজ্বল করছে, ব্যাণ্ডটা মনে হয় সোনার। একটা দুর্লভ মূল্যবান টোপ। ঘড়িটা যেন সাপের মতো আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বুকের মধ্যে টিপটিপ করছে আমার, বন্ধ বাথরুমের মধ্যে আমাকে কেউ দেখবে না, কোনো সাক্ষী নেই। কিন্তু ঐটুকু ছোট্ট বন্ধ ঘরে নিজেকে বিষম দেখা যায়, আমি দারুণ ভয় পেয়ে গেলাম, পেচ্ছাপ না করেই প্রায় দৌড়ে পালিয়ে এলাম। সঙ্গিনী জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে কি?

—বুক কাঁপছে?

—কেন?

—বুকের দোষ।

বেয়ারাকে বিল আনতে বলেছি, ট্রেতে করে সে নিয়ে এলো সেই ঘড়ি। জিজ্ঞেস করলো, সাব, ইয়ে আপকা হ্যায়? বাথরুমমে—

সবুজ সাপের মতন সেই ঘড়িটা দেখছে আমাকে। এখানে অনেক মানুষ আমাকে দেখছে। আমি নিজেকে নিজে দেখতে পাচ্ছি না। গম্ভীরভাবে বললাম হ্যাঁ, এটা আমার। সঙ্গে সঙ্গে সেটা তুলে নিয়ে বেয়ারাকে প্রচুর বকশিস্ দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম সেখান থেকে। সঙ্গিনী ক্রুদ্ধভাবে জিজ্ঞেস করলো, এর মানে কি, আমি আগেই জানতে চাই। যা তোমার নয়—

—হ্যাঁ, এটা আমারই।

—তোমার হাতে ঘড়ি ছিল না!

—এই ঘড়িটা আমার নয়! কিন্তু এ আমার জন্য দুঃসময় নিয়ে এসেছে। সেই দুঃসময়কে আমি···ঘড়িটা আমি অত্যন্ত জোরে ফুটপাতে আছড়ে ফেললাম। টুকরো টুকরো হয়ে সেটা ছিটকে ছড়িয়ে গেল। এখন থেকে সময় আমার কাছে স্থিরমুহূর্ত!



অন্য আয়না

ব্যারাকপুরে এক বন্ধুর বাড়িতে আমার নেমন্তন্ন ছিল, সেখান থেকে রাত্তিরে আর বাড়ি ফেরা হয় নি। পরদিন সকালে ফিরতে ফিরতে সাড়ে আটটা বেজে গেল। দরজা খুলেই বৌদি বললেন, একজন ভদ্রমহিলা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে বসে আছেন।

অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা হয়েছে, ভালো করে ঘুম হয়নি। তাছাড়া অফিসে দরকারি কাজ আছে, ছুটি নেবারও উপায় নেই, এক্ষুনি চান খাওয়া সেরে ছুটতে হবে। এই সময় ভিজিটর এলে কারুর ভালো লাগে ? তবু, মহিলা বলে কথা, কিছুটা সময় দিতেই হবে।

বসবার ঘরে ঢুকে দেখি ঠিক মাঝখানের চেয়ারটিতে একজন মহিলা বেশ রাজেন্দ্রাণীর ভঙ্গিতে বসে আছেন। পরনে দামি শাড়ি, গায়ের শালটিও বেশ কারুকার্য করা। মেয়েদের বয়েস আমি ঠিক ধরতে পারি না, তবে এই মহিলার বয়স যে অন্তত পঞ্চাশ-ছাপান্ন হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে, ফর্সা টুকটুকে রং বলে তা স্পষ্ট বোঝা যায়, মাথার ঈষৎ কোঁকড়া চুল কিন্তু সম্পূর্ণ কালো, মনে হয় রং করা। ভদ্রমহিলা তাঁর যৌবনকালে যে যথেষ্ট সুন্দরী ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমি খানিকটা অভদ্রের মতন বেশি ব্যস্ততা দেখিয়ে বললুম, নমস্কার,

কি ব্যাপার বলুন তো ?

ভদ্রমহিলা একটি পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিলেন, মুখ তুলে হাসিমুখে আমাব দিকে এক মুহূর্ত চুপ করে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ভাঙা গলায় বললেন, তুমিই সুনীল ? আমি তোমার জন্য কতদূর থেকে এসেছি বলো তো ? তুমি তো রাত্তিরে বাড়িতে ফেরো নি। যাও, মুখ টুখ ধুয়ে এসো, তারপর কথা হবে। আমি বসছি, আমার তাড়া নেই।

কিন্তু আমার তাড়া আছে! সেটা তক্ষুনি মুখের ওপর বলা যায় না। ভদ্রমহিলার চেহারা ও ব্যক্তিত্বে একটা সম্ভ্রান্ত ভাব আছে। ভদ্রমহিলার বয়স আমার থেকে যথেষ্ট বেশি হলেও আমিও তো আর ছেলেমানুষ নই, প্রথম আলাপে আমাকে কেউ চট করে তুমি বলে না!

বসবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বৌদিকে জিজ্ঞেস করলুম, কে ইনি ?

বৌদি মুচকি হেসে বললেন, উনি দিল্লিতে থাকেন, শুধু তোমার সঙ্গেই দেখা করার জন্য কলকাতায় এসেছেন। আমার সঙ্গে গল্প করছিলেন। দিল্লিতে ওঁর স্বামীর কিসের যেন ব্যবসা। তিনটি ছেলেমেয়ে আছে। কাল রাত্তিরে কলকাতায় পৌঁছেছেন। আজ সক্কালেই ঠিকানা খুঁজে খুঁজে এসেছেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

বাথরুমে গিয়ে টুথব্রাশটা খুঁজতে খুঁজতে বললুম, বৌদি, দুকাপ চা করে দাও। গেল আজ অফিসের দেরি হয়ে! কেন যে উইকডেতে সকালবেলা এরা আসে! কোনো সেন্স নেই!

বৌদি বললেন, লোকে ভাবে কবি-টবিদের কোনো অফিস থাকে না, তারা চাকরি বাকরি করে না! তারা বসন্তের বাতাস খেয়ে থাকে। তা বলে ভদ্রমহিলার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করো না। অতদূর থেকে উনি এসেছেন।

খানিকবাদে আবার বসবার ঘরে এসে চায়ের কাপ হাতে দিয়ে বললুম, হ্যাঁ, বলুন। আপনি দিল্লিতে থাকেন ?

ভদ্রমহিলা সে কথার উত্তর না দিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন এক দৃষ্টিতে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, দাঁড়াও আগে তোমাকে

দেখি ভালো করে। কতো তোমার কথা শুনেছি, তোমার কতো লেখা পড়েছি। এর আগে তোমাকে চোখে না দেখলেও তুমি যে আমার অনেক দিনের চেনা গো?

মনে মনে ভাবলুম, এই রে! এইরকম ধানাই পানাই শুরু করলে কতো সময় লাগিয়ে দেবে, তার কোনো ঠিক আছে! এরা ভাবে, নিজেদের কোনো কাজ না থাকলে অন্যদেরও কোনো কাজ থাকতে পারে না।

আমি চা শেষ করে একটা সিগারেট ধরাবার পর বললেন, তুমি কেমন আছো, সুনীল? তোমার শরীর ভালো আছে তো?

আমি অধৈর্যের সঙ্গে বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার শরীর খুব ভালো আছে।

ভদ্রমহিলা বললেন, ওমা, তুমি আমার সঙ্গে আপনি আজ্ঞে করে কথা বলছো কেন? আমি যে তোমার অনেক দিনের বন্ধু। আমাকে তুমি, তুমি বলবে!

এসব সিনেমা সিনেমা সংলাপ আমার পছন্দ হয় না। অবশ্য ভদ্রমহিলার বয়েস যদি অর্ধেক হতো, তা হলে আমার মনের ভাব কি হতো তা বলা যায় না। উনিই বা এই বয়েসে এ ভাবে কথা বলছেন কেন? যে বয়েসে যা মানায়!

—আপনি কি কলকাতায় কিছুদিন থাকবেন? পরে যদি আর একদিন আসেন, কোনো রবিবার-টবিবার, আজ আমাকে অফিসে যেতে হবে।

—তোমাকে আজ অফিসে যেতে হবে না। আমি কতোদূর থেকে এসেছি তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য!

তিনি হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে একটা নতুন কলম বার করে বললেন, এই নাও, এটা তোমার জন্য এনেছি।

লেখকদের নাকি কলম সম্পর্কে দুর্বলতা থাকে। কোনো কোনো লেখকের এক শো দু'শো কলম আছে শুনেছি। আমার ওসব বাতিক নেই। আমি সাধারণ ডট পেনে লিখি। হাতের কাছে যখন যেটা পাই। ভদ্রমহিলার কলমটা বেশ দামীই মনে হচ্ছে। দামী কলম নিয়ে আমি কি করবো?

দামী কলমের জন্য দামী কাগজ দরকার, সেরকম আজকাল পাওয়াই যায় না। কিন্তু কেউ কিছু উপহার দিলে সেটা ফিরিয়ে দেওয়া অভদ্রতা। আমি শুকনো ভাবে বললুম, ধন্যবাদ!

—তুমি এই কলমটা দিয়ে আমার নামে একটা সুন্দর কবিতা লিখবে, কেমন?

আমি মুখ নিচু করে হাসি গোপন করলুম। ভদ্রমহিলা আবার বললেন, তুমি কাল রাত্তিরে বাড়ি ফেরো নি। কবিরা খুব বোহেমিয়ান হয়! আমারও খুব রাত জাগতে ভালো লাগে। এক একদিন ইচ্ছে করে সারা রাত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই!

এবারে আমার অন্যরকম একটা সন্দেহ হলো। ভদ্রমহিলার কি নিজের বয়েসটা একদম খেয়াল নেই? উনি অনায়াসেই আমার কাকিমা বা পিসিমা হতে পারতেন। উনি এসব কি বলছেন?

—আপনার নাম কি?

—ও, এই গ্যাখো, আমার নামটাই বলা হয়নি এখনো। আমার নাম রত্না রায়চৌধুরী। আমাদের বাড়ি ছিল বহরমপুরে। বিয়ের পর থেকে দিল্লীতেই আছি। সে অনেকদিন হয়ে গেল। প্রায় চল্লিশ বছর। কলকাতাতে খুব কম আসা হয়। কাল রাত্রে পৌঁছেই ফোন করলুম রবিশঙ্করকে। ওকে খবর না দিলে রাগ করবে তো কিন্তু ওর সঙ্গে কথা হলো না।

—কাকে ফোন করেছিলেন?

—রবিশঙ্করকে। তুমি চেনো না?

শুধু রবিশঙ্কর নামটা শুনলে একজনের কথাই মনে পড়ে। তাঁকে প্রায় সারা পৃথিবীর লোকই এখন চেনে। কিন্তু মহিলাটি এমনভাবে কথাটা বললেন যেন রবিশঙ্কর আমার কোনো বন্ধুর নাম।

সন্দেহ কাটাবার জন্য আমি বললুম, রবিশঙ্কর মানে···যিনি সেতারে···

হ্যাঁ, তা ছাড়া আর ক'জন রবিশঙ্কর আছে? তুমি জানো, এতো বিখ্যাত হলে কি হয়, মানুষটা বড়ো দুঃখী! বড়ো একা!

রবিশঙ্করের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই। অফিসের দেরি করে সে কথা আলোচনা করাও কি আমাব পক্ষে সঙ্গত?

আমি ভুরু কুঁচকে তাকাতেই তিনি আমার দিকে বালিকার মতন ভঙ্গি করে রহস্যময় হাসি হাসলেন। তারপর বললেন, আমাকে কথা বলতে দিলো না। ওর বউ ফোনটা ধরেছিল, আমার গলা শুনেই চিনতে পেরেছে। হিংসে করে তো খুব আমাকে!

রবিশঙ্করের বউ! তাও আবার কলকাতায়? এসব কি উল্টোপাল্টা বলছেন মহিলা। আমার কেমন যেন খট্‌কা লাগলো। আব রবিশঙ্কর যতই বিখ্যাত হোন, আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে কেউ রবিশঙ্কর সম্পর্কে গল্প করে যাবেন, এটাও ঠিক মানা যায় না বোধহয়।

আমি খানিকটা কঠোরভাবেই এবার জিজ্ঞেস করলুম, আপনি কি আমার কাছে কোনো দরকারে এসেছেন?

আমার কণ্ঠস্বরের উষ্মা গায়ে না মেখে রত্না রায়চৌধুরী আবার হাসলেন। আবার তাঁর দামী চামড়ার হাত ব্যাগটা খুলে একটি ছোট্ট লাল রঙের নোট বই বার করে বললেন, তোমার কাছে তো বিশেষ দরকারে এসেছি। তোমার সাহায্য ছাড়া চলবে না। আমি কবিতা লিখেছি, তুমি দেখে দেবে।

আমি দীর্ঘশ্বাস গোপন করলুম। এরকম উপদ্রব আমাকে প্রায়ই সহ্য করতে হয়। তবে ও রকম বেশি বয়েসী কোনো মহিলা আগে আসেন নি। ভদ্রমহিলার বিয়ে হয়েছে চল্লিশ বছর আগে, তা হলে এঁর বয়েস ষাটের আশেপাশে হবেই। তবে ওঁর মুখের হাসিটি অল্প বয়েসী মেয়েদের মতন।

ছোট্ট খাতাটি হাতে নিয়ে দেখলুম সেটা প্রায় ভর্তি কবিতায়। প্রথম কবিতাটির নাম 'তুমি'। খুবই আবেগময় প্রেমের উচ্ছ্বাস, ভাষা খুবই কাঁচা, কোনো মতেই কবিতা পদবাচ্য নয়। পরের পাতাগুলোতেও ঐ একই ব্যাপার, বিশেষ কোনো একজনকে উদ্দেশ্য করেই এগুলি লেখা হয়েছে, তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

সব কবিতাগুলো পড়বার দরকার নেই। তবু আমি খাতাটা হাতে নিয়ে খানিকটা সময় নিলুম। অন্যদের যা বলি তা কি এঁকেও বলা যাবে? অল্প বয়েসী ছেলেমেয়েদের বলি ছন্দের চর্চা করতে, অনেক লিখে আগে হাত পাকাতে। ষাট বছরের এক মহিলা কবে আর হাত পাকাবেন?

রত্না রায়চৌধুরী বললেন, এই আমার জীবনের প্রথম কবিতা, বুঝলে সুনীল। আমাদের বয়সে কেউ কোনোদিন কবিতা লেখেন নি, আমি নিজেও তো জীবনে কখনো কবিতা লেখার কথা ভাবিনি। দেখতেই তো পাচ্ছো, বাংলা বানান ভালো জানি না। এখন বাংলা থেকে হিন্দি ভালো বলতে পারি।

—তাহলে হঠাৎ বাংলায় কবিতা লেখার কথা মনে হলো কেন আপনার?

—ঠিক বলেছো, হঠাৎ! একদম হঠাৎ! কেন যে লিখলুম তা আমি নিজেই জানি না। হঠাৎ একদিন মাঝ রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেল। আমি ধড়মড় করে উঠে বসলুম, তারপর আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, 'ভুল করেছি, তোমার কথা শুনিনি, তুমি ভুল বুঝো না আমায়, ওগো কান্না আমার ঝর্ণা হয়ে হারিয়ে গেল কোথায়!' আমি নিজেই একেবারে অবাক। এর মানে কি? এরকম কবিতার মতন কথা কি করে বেরিয়ে এলো আমার মুখ দিয়ে? শুধু ঐ কটা নয়, আরও বলতে লাগলুম, বুঝলে! আমার স্বামী পাশের খাটে ঘুমিয়ে আছে, আজকাল ও আমার সঙ্গে শোয় না, আমি জোরে এইসব বলে যাচ্ছি, তাও জাগলো না। রোজ ড্রিংক করে তো, সহজে ঘুম ভাঙে না।

আমি মুখ নিচু করে হাসতে লাগলুম। এ যে দেখছি বাল্মীকির মতন ব্যাপার। হঠাৎ একদিন মুখ থেকে ঝরঝর করে বেরিয়ে এলো কবিতা! মুখ তুলে দেখি রত্না রায়চৌধুরী স্থির ভাবে তাকিয়ে আছেন, তাঁর দু'চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে।

এই অবস্থায় কঠোর কথা বলা যায় না। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, খাতাটা রেখে যান, আমি পরে ভালো করে পড়ে রাখবো। আজ আমায় এখন বেরুতেই হবে।

উনি হাত তুলে বললেন, আর একটু বসো প্লিজ ! আমি অনেক-দূর থেকে এসেছি ! আমার আর একটু কথা আছে।

হতাশ ভাবে বসে পড়ে বললুম, বলুন !

—যেদিন রাত্তিরে এরকম হলো, তার পরদিন সকালে ভাবলুম, ওসব বোধহয় স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু লাইনগুলো সব মনে আছে। এই সব লাইন কে বানালো ? লিখে রাখলুম এই খাতাটায়। তারপর দু'তিন দিন আর কিছু হলো না। খাতা নিয়ে কিন্তু লেখার চেষ্টা করলুম, কিছু মাথাতেই আসে না ছাই ! একটা লাইনও বানাতে পারি না। তারপর আবার একদিন মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেল, কে যেন জোর করে আমায় টেনে তুললো, আবার আমি গড়গড় করে কবিতা বলতে লাগলুম, খুব ভালো কবিতা এসব আগে কেউ লেখেনি, কোনো বইতে নেই. আমার নিজেরই বানানো।

—এসব কবিতা অন্য কারুকে দেখিয়েছেন ?

—প্রথমে ভেবেছিলুম, শুধু একজনকেই দেখাবো। কিন্তু তাকে যে পাওয়া যায় না। কখন কোথায় থাকে তার ঠিক নেই, সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায়। তাই একদিন আমার স্বামীকে দেখালুম। ও কী বললো জানো ?

—কি ?

—কি বলো তো ? আন্দাজ করো।

—দেখুন, আপনার স্বামীকে তো আমি চিনি না, কি করে আন্দাজ করবো তিনি কি বলবেন ?

—ও বললো, আবার তুমি পাগলামি শুরু করেছো ? এসব কবিতা না তোমার মুণ্ডু। ও খাতাটা ছুঁড়ে ফেলে দাও আস্তাকুঁড়ে ! ভাবতে পারো, কেউ বলতে পারে এরকম কথা ?

আমার মনে হলো, ভদ্রমহিলার স্বামী খুব একটা ভুল কিছু বলেন নি। কিন্তু আমি কৃত্রিম সমবেদনা দেখিয়ে বললুম, তাই নাকি ?

—হ্যাঁ, ও তো এই রকমই কথা বলে। সারা জীবনই তো আমার কোনো ব্যাপারে ওর উৎসাহ নেই। আমি বিয়ের আগে নাচ শিখে-

ছিলুম, জ্ঞানো ও নাচ বন্ধ করে দিয়েছে। গানের গলা ছিল, বাপের বাড়ি থেকে হারমোনিয়াম নিয়ে গিয়েছিলুম, সেটাকে সারাতে দেবার নাম করে একটা দোকানে দিয়ে এলো, আর কোনো দিন নিয়ে এলো না! তার মানে বুঝলে ? ও চায় না, আমি নাচি গান করি। কারুর সঙ্গে মিশতেও দিতো না। সব সময় আগলে আগলে রাখতো। আমি সুন্দরী ছিলাম তো, তাই ভয় ছিল আমাকে যদি অন্য কেউ নিয়ে যায় ?

এবারে আমি ভালো করে তাকিয়ে দেখলুম, ভদ্রমহিলা যে কিছুদিন আগেও যথেষ্ট সুন্দরী ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। উনি তখন আমার কাছে আসেন নি কেন ?

রত্না রায়চৌধুরী আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বললেন, গানবাজনা, নাচ সব ছেড়ে দিলুম কেন জানো ? ওর জন্য আমি সত্যি ভালবাসতুম যে। ও তার কোনো মূল্য দেয় নি। বাড়িতে পুতুল বানিয়ে রেখেছিল। এখন তাকিয়েও দেখে না আমার দিকে। এক সময় একজন আমার মূল্য বুঝেছিল, তখন তার ডাকে সাড়া দিইনি।

ভদ্রমহিলাকে এখন কথার নেশায় পেয়ে বসেছে ! আমি আর একটি সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, আপনি আমার ঠিকানা পেলেন কোথায় ?

হঠাৎ যেন ঘোর ভেঙে গেল। কথা থামিয়ে ভদ্রমহিলা আমার দিকে আবার তাকিয়ে রইলেন একদৃষ্টে। বাইরে কেউ দরজায় বেল দিতেই আমাকে উঠে যেতে হলো। সেরকম কেউ নয়, একজন ফেরিওয়ালা।

ফিরে এসে দাঁড়িয়েই বললুম, তা হলে এই পর্যন্ত আজ থাক। আপনি এই রবিবার সকালে আসুন না।

মিনতিমাখা চোখ হলেও খানিকটা আদেশের সুরে তিনি বললেন, আর একটু বসো। আমি একা চলাফেরা করতে পারি না। আমার ভাসুরের বাড়িতে এসে উঠেছি। আজ ওঁদের একটা গাড়ি পেয়েছি। রোজ তো পাবো না।

আমি আবার বসলুম।

—তোমার লেখাটেখা আমি আগে বিশেষ পড়িনি। বই পাই না তো ওখানে। আমার এক দেওরের মেয়ে কবিতা টবিতা লেখে। তাকে আমার এই খাতাটা একদিন পড়ালুম। ও বললে, জ্যাঠাইমা, তুমি এগুলো সুনীলবাবুকে দেখাও, উনি ঠিকঠাক করে ছাপার ব্যবস্থা করে দেবেন।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বিমর্ষ মুখ করে বললুম, কিন্তু আমার তো ছাপিয়ে দেবার কোনো ক্ষমতা নেই। আমি পড়ে মতামত দিতে পারি।

একটু আগে কাঁদছিলেন মহিলা. এখন মুখে ঝিকিমিকি করছে হাসি। মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, তুমি ইচ্ছে করলে নিশ্চয়ই পারো। তোমার কত জায়গায় চেনাশুনো। তুমি আমার কবিতাগুলো একটু ছাপিয়ে দাও, সুনীল। আমার বিশেষ দরকার আছে। কি দরকার বলো তো?

—আপনিই বলুন!

—ওকে তো আমি নিজে গিয়ে এই কবিতাগুলো দেখাত পারবো না। ওর বউ আমাকে হিংসে করে। টেলিফোন করলে টেলিফোন দেয় না, এখন ও কলকাতায় আছে আমি জানি, কাগজে দেখেছি, তবু ওর বউ বললো, আমার সঙ্গে এখন দেখা করা সম্ভব নয়। আমার গলা শুনেই চিনে ফেলেছে তো!

—আপনি কার কথা বলছেন?

—রবিশঙ্কর। ও যে আমায় ভালবাসে। ওর জন্যই তো এই কবিতা-গুলো বেরিয়ে এলো আমার মন থেকে। কতদিন ওর সঙ্গে দেখা হয়নি জানো? কুড়ি বছর!

এবারে আমার আবার খট্‌কা লাগলো. রবিশঙ্করের এখন কোনো বউ আছে বলে তো শুনিনি! কুড়ি বছর রবিশঙ্করের সঙ্গে দেখা হয়নি, তবু এঁর গলা শুনেই রবিশঙ্করের তথাকথিত স্ত্রী চিনে ফেলেছেন এঁকে!

—রবিশঙ্করের সঙ্গে আপনার কোথায় আলাপ?

—আমাদের বাড়িতে এসেছিল যে একদিন। বাজনা বাজিয়েছিল। ছবি আছে, দেখবে?

হাত ব্যাগ থেকে তিনি একখানা ছবি বার করলেন। অনেক পুরানো ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট ছবি, এখন হলদেটে হয়ে এসেছে। কোনো জায়গায় বসে রবিশঙ্কর সেতার বাজাচ্ছেন। তবলচির পাশে একজন সুন্দরী যুবতী। হ্যাঁ, সুন্দরী ঠিকই। তার পাশে আর একজন পুরুষ। রত্না রায়চৌধুরী ঝুঁকে পড়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, এই দ্যাখো, আমার ছবি। চিনতে পারছো? আর এই আমার স্বামী।

আমি ছবিটির দিকে তাকিয়ে রইলুম।

—সেদিন আমি একটা গান গেয়েছিলাম। রবিশঙ্কর আমাকে দেখেই বললো, তোমাকে দেখলেই মনে হয় তুমি গান জানো। গান করো না একটা। আমি তাকালুম আমার স্বামীর দিকে। রবিশঙ্কর নিজে অনুরোধ করেছে তো, তাই আপত্তি করলো না। বললো, গাও। গাইলুম। মাত্র একখানা। চর্চা ছিল না তো। সেই গান শুনে রবিশঙ্কর বললো, বাঃ! সুন্দর! তুমি চর্চা করো, তোমার হবে।

—আর দেখা হয় নি?

—হ্যাঁ। আর একদিন দেখা হয়েছিল। ঐ দিল্লীতেই। আমার পরিচয় দিলুম। রবিশঙ্কর খুব দুঃখ করে বললো, তুমি গান গাও না? কি ভীষণ দুঃখ ছিল সেই গলার আওয়াজে তা তুমি বুঝবে না। তখনও বুঝিনি যে ও আমায় ভালবেসে ফেলেছে। আমি ঘরের বউ, ঘরের বউ হয়েই থাকতে চেয়েছিলুম।

—তারপর?

—তারপর অতিকষ্টে দু'বার ওর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছি। ওর বউ জানতে পারলেই লাইন কেটে দেয়। কিন্তু জানি, ও এখনো আমার জন্য প্রতিক্ষা করে আছে।

আমি একবার ভাবলুম, পাশের ঘর থেকে একটা আয়না এনে ভদ্রমহিলার মুখের সামনে ধরি। ষাট বছর বয়েস, রীতিমতো গিন্নিবান্নি, উনি এসব কি প্রেমের কথা বলছেন! রবিশঙ্করের জীবনী আমি পড়েছি। কোনো একদিন গান বাজনার আসরে রত্না রায়চৌধুরীর মতন একজন

সুন্দরী যুবতীর গান শুনে উনি উৎসাহ দেবার জন্য বলেছিলেন, বাঃ, তোমার গানের গলা তো বেশ ভালো, তুমি চর্চা করো! এরকম কথা উনি হয়তো আরও শত শত মেয়েকে বলেছেন!

রত্না রায়চৌধুরী বললেন, তুমি আর একটা কথা শুনবে? কয়েক মাস ধরেই আমার মনটা খুব খারাপ। খালি মনে হচ্ছিল বেঁচে থেকে আর লাভ নেই। কি হবে এই জীবনটা নিয়ে। কতই তো করে দেখলাম অন্যদের জন্য। তারপর একদিন মনে পড়লো রবিশঙ্করের কথা। ও আমায় ভালবেসেছিল, ও চেয়েছিল আমি বড় হই। সেইদিন রাত্রে আমার ঘুম ভেঙে গেল, আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো ঐ কবিতা। আমি যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলাম।

এতক্ষণ আমি ঠাট্টা-ইয়ার্কির ভাব নিয়ে ভদ্রমহিলার কথা শুনছিলাম, এবারে রত্না রায়চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার সর্বশরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল। যেন আমি একটা অলৌকিক দৃশ্য দেখছি। রত্না রায়চৌধুরীর বয়েস কমে গেছে কুড়ি বছর, মুখখানা জ্বলজ্বল করছে। জীবনের ব্যর্থতা বোধের মধ্যে একটা ভালবাসার স্মৃতি যেন তাকে এই মুহূর্তে নতুন রূপ দিয়েছে। সেই ভালবাসার স্মৃতি থেকে উৎসারিত হয়েছে কবিতা। শুধু ছন্দ, মিল, শব্দ দিয়ে এ কবিতার বিচার হয় না। এ রচনা একজন মানুষের জীবনে, কবিতার চেয়ে অনেক বড়।

আমি বললুম, আপনার কবিতা কিন্তু চমৎকার হয়েছে। কারেকশান করার কিছুই নেই। আপনি যদি চান, আমি নিজে নিয়ে গিয়ে এই কবিতা রবিশঙ্করকে দেখাতে পারি। ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।

আমার হাত দুটি জড়িয়ে ধরে ব্যাকুলভাবে মহিলা বলতে লাগলেন, সত্যি তুমি দেখবে? সত্যি? তুমি ওকে বলো, আমি আজও ওকে ভুলিনি। বুকের মধ্যে যত্ন করে রেখে দিয়েছি।

বাবা

বাইরের ঘরের জানলা দিয়ে সকালবেলা বেশ সুন্দর রোদ্দুর আসে। ওটাই বসবার ঘর, আর ওটাই ছেলে মেয়েদের পড়বার ঘর। সকালবেলা হঠাৎ কোনো অতিথি এসে গেলে মুস্কিল হয়, ছেলে মেয়েদের পড়াশুনোর মাঝখানেই অতিথিকে বসিয়ে কথা বলতে হয়। নিতু, সিতু, মান্তুরা এই জন্য রাগ করে।

শীতকালে ঐ সিল্কের চাদরের মতন রোদটা উপভোগ করবার জন্য জয়দেব নিজেই এসে বসেন ঐ জানলার ধারে, খবরের কাগজ নিয়ে অনেকটা সময় কাটান। এটাও নিতু, সিতু, মান্তুদের পছন্দ নয়। মান্তু প্রায়ই বলে, বাবা, তুমি ভেতরে যাও না। তুমি থাকলে আমাদের পড়াশুনোর অসুবিধে হয়!

আজকাল ছেলে মেয়েরা বাবাকে একটুও ভয় পায় না। জয়দেবদের ছেলেবেলায় কাছাকাছি বাবার চটি জুতোর শব্দ শুনলেই ভয়ে বুক কাঁপতো। বাবা ও জ্যাঠামশাই মাঝে মাঝেই হুংকার দিতেন, এই ছেলেমেয়েরা, মুখ বুজে আছিস কেন, কী হচ্ছে ওখানে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়! এখন নিতু, সিতু, মান্তুদের ওসব বালাই নেই। চেঁচিয়ে পড়ার কথা বললে ওরা হাসে। ওদের পড়াশুনোর ব্যাপারে বেশি নাক গলাতে গেলে চটে যায়। মান্তু একদিন বলেছিল, বাবা, তুমি তো সায়েন্স পড়েছিলে, তুমি ইকনমিক্‌সের কী জানো? আমি কতটা পড়ছি, না পড়ছি

তা তুমি কী করে বুঝবে ?

অবশ্য ছেলে মেয়ে তিনটিই পড়াশুনোয় বেশ ভালো। প্রাইভেট টিউটর রাখতে হয় না। টপাটপ পাশ করে যায় শুধু না, ভালো রেজাল্ট করে। মান্তু স্কলারশিপ পেয়েছে।

তবু শীতকালের এই আরামটুকু ছাড়তে রাজি নন জয়দেব। একতলার ফ্ল্যাটে আর কোনো ঘরে এরকম আলো হাওয়া ঢোকে না। জানলার ধারে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে তিনি বলেন, তোরা পড়াশুনো কর বা গল্প কর, যা খুশী কর, আমি কিছু শুনছি না, আমি কাগজ পড়ছি !

বড়ো ছেলে সত্য বদলি হয়েছে জামশেদপুরে, সেখানে সে একা থাকে। তার বউ ছেলে মেয়ে এখানে। দুটি যমজ নাতি মাঝে মাঝে তার ঘাড়ে চড়ে উপদ্রব করতে আসে। ওদের সঙ্গে খুনসুটি করতে করতে, হাসতে হাসতে জয়দেবের খেয়াল থাকে না, তখন মান্তু ধমক দিয়ে বলে, আঃ বাবা, তোমার জন্য আমরা পড়তে পারছি না। কেউ কখনো শুনেছে, বাবার জন্য ছেলে মেয়েদের পড়াশুনোর ক্ষতি হয় ?

মান্তুর স্বভাবটা প্রায় তার মায়ের মতন, সব কথার মধ্যেই ধমকের সুর। শুনতে জয়দেবের খারাপ লাগে না, অনেক দিনের অভ্যেস তো !

সাড়ে ন'টার সময় মান্তুরা একে একে স্নান করতে যায়। দুপুরবেলা এই ঘরটা ফাঁকা। তখন অবশ্য রোদ পোহাবার দরকার থাকে না। কলকাতার শীতে দুপুরের রোদ আরামদায়ক নয়। তবু দুপুরবেলা জয়দেব এই ঘরেই অনেকটা সময় কাটান। রিটায়ার করার পর থেকে তাঁর খুব বই পড়ার ঝোঁক হয়েছে। অন্য কোনো বই না পেলে তিনি এক একদিন ছেলে মেয়েদের বই ঘেঁটে দেখেন পড়ার মতন কিছু আছে কিনা।

সদর দরজাটা খোলা, তবু কলিং বেল বাজলো এই জানলা দিয়েই পুরো রাস্তাটা দেখা যায়। জয়দেব মুখ বাড়িয়ে দেখলেন, সদ্য পাট-ভাঙা ধুতি ও মুগার পাঞ্জাবি পরা একজন সুদর্শন যুবক দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। একে আগে কখনো দেখেননি জয়দেব।

তিনি জানলা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এই যে ভাই, এদিকে আসুন। বলুন, কাকে খুঁজছেন ?

যুবকটি সরে এসে বললো, উজ্জয়িনী আছে ?

মান্তুর ভালোনাম উজ্জয়িনী। জয়দেব টেবিলের ওপর টাইমপীসটা দেখলেন। মান্তু স্নান করে খেয়ে বেরিয়ে গেছে কি না তিনি খেয়াল করেননি, তবে এখনো সাড়ে দশটা বাজেনি।

একবার বাইরের দু'তিনটি ছেলে মেয়ে এরকম মান্তুর খোঁজ করতে এসেছিল, জয়দেব দরজার সামনে থেকেই মান্তু, মান্তু বলে চেঁচিয়ে ডেকেছিলেন বলে মান্তু খুব রাগ করেছিল। বাইরের লোকের সামনে তার ডাকনাম ধরে ডাকা ঠিক হয়নি। তা ছাড়া ওরকম চেঁচিয়ে ডাকাও নাকি আজকালকার প্রথাবিরুদ্ধ। কিন্তু মান্তুকে তো তিনি কোনোদিন উজ্জয়িনী বলে ডাকেননি, জিভে কেমন যেন আটকে যায়। মান্তু বলেছিল, যদি আমাকে কখনো উজ্জয়িনী বলে না-ই ডাকবে, তা হলে ঐ নামটা রেখেছিলে কেন ? শুধু মান্তু নাম রাখলেই পারতে ! বাবা-মায়ের দেওয়া নাম বুঝি শুধু অন্যদের জন্য ?

জয়দেব যুবকটিকে বললেন, আপনি ভেতরে এসে বসুন, আমি দেখছি।

যুবকটি বললেন, না, না। আমি বসবো না, শুধু একটা কথা বলে চলে যাবো।

জয়দেব ভেতরে চলে গেলেন। এখনো বেরিয়ে যায়নি মান্তু, খেতে বসেছে। জয়দেব তার পাশে গিয়ে মুচকি হেসে বললেন, এই যে উজ্জয়িনী দেবী, খুব সুন্দর দেখতে তোমার এক বন্ধু তোমাকে ডাকছে !

মান্তু এবং তার মা একই সঙ্গে বলে উঠলো, কে ?

জয়দেব বললেন, নাম তো জানি না। আগে কখনো দেখিওনি !

মান্তু ভুরু কুঁচকে দু'এক মুহূর্ত চিন্তা করলো। তারপর এঁটো হাতেই সে ছুটে গেল দরজার কাছে। তার পরেই এক অদ্ভুত বিস্ময়ে চিৎকার করে বললো, ওমা, আপনি ? আসুন, আসুন, বসবেন আসুন ! না, না, একটু বসতেই হবে। এক মিনিট, প্লিজ, আমি হাতটা ধুয়ে আসছি !

বাকি ভাত-টাত আর খেলেই না মান্তু, ফিরে এসে হাত মুখ ধুতে ধুতে বললো, মা, একটু চা হবে ?

মেয়ের বন্ধুর সঙ্গে কথা বলার সময় বাবার উপস্থিত থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। জয়দেব শুধু একবার বসবার ঘরে ফিরে এলেন খবরের কাগজটা নেবার জন্য। কুণ্ঠিত ভাবে তিনি আগন্তুকটির দিকে একটু হাসি দিয়ে কাগজটি তুলে নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন তাড়াতাড়ি।

একটা ব্যাপারে তাঁর মজা লাগলো। যে-মান্তু বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে সব সময় বকে বকে কথা বলে, এখন তার গলা দিয়ে কী মিষ্টি স্বর বেরুচ্ছে। ছেলেটিকে দেখে মান্তুর মুখেও খুব গদগদ ভাব।

হিমানী জিজ্ঞেস করলেন, কে এসেছে ? মান্তুর ইউনির্ভাসিটি যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে না ?

জয়দেব দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, আমি তো নাম জানি না। তুমি গিয়ে নাম জিজ্ঞেস করে এসো, কিংবা মান্তুকে বলো যে ওর দেরী হয়ে যাচ্ছে !

হিমানী একটা রাগের মুখভঙ্গি করলেন। হিমানীরও বাইরের লোকের সামনে মান্তুকে এরকম কথা বলার সাহস নেই !

বাবা কিংবা মা কেউই মান্তুকে শাসন করতে পারে না। ইউনির্ভাসিটিতে ওঠার পর থেকে মান্তু যখন খুশী বাড়ি থেকে বেরুতে পারে। এক এক-দিন রাত সাড়ে আটটা, ন'টার সময় বাড়িতে ফেরে, মাঝখানে একবার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে শান্তিনিকেতন ঘুরে এলো দু'দিনের জন্য, সেই বন্ধুদের দলে দু'একটি ছেলেও ছিল। কিন্তু মান্তুর মুখে এমন একটা সার-ল্যের তেজ আছে যে তাকে বকুনি দেবার উপায় নেই। মান্তুর পক্ষে কোনো অন্যায় কাজ করা যেন সম্ভবই নয়। শান্তিনিকেতনে গিয়ে ওরা থাকার জায়গা পায়নি। পাঁচজন ছেলে মেয়ে মিলে বোলপুরের এক হোটেলে একটা ঘরে রাত কাটিয়েছে। মান্তু নিজেই এই গল্প শুনিয়েছে মজা করে, যেন এ কাহিনী শুনে বাবা মায়ের মনে করার মতন কোনো ব্যাপারই থাকতে পারে না।

আজকের ছেলেটিকে জয়দেবের বেশ পছন্দ হয়েছে। আজকাল ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ইয়াংম্যান তো দেখাই যায় না। শুধু সেজন্য নয়, ওর মুখে বেশ একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে, দেখলেই বোঝা যায় ভালো পড়া-শুনো জানে। জোর করে ধরে বেঁধে, কিংবা নিজেরা সম্বন্ধ করে মান্তুর যে বিয়ে দেওয়া যাবে না, তা জয়দেব আর হিমানী দু'জনেই জানেন। সে চেষ্টাও তাঁরা করবেন না। কী একটা প্রসঙ্গে মান্তু একদিন হিমানীকে বলেছিল, আমার যেদিন ইচ্ছে হবে সেদিন যাকে খুশী বিয়ে করবো, তোমরা তার আগে একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারবে না।

তবু হিমানী মেয়ের বিয়ের চিন্তা করেন। রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে জয়দেবকে বকুনি দেন। জয়দেবকে তখন বলতে হয়, মান্তু যাকে পছন্দ করবে, সে কক্ষণো খারাপ হতে পারে না।

আজকের এই যুবকটিই যদি মান্তুর সেই পছন্দের পাত্র হয়, তা হলে দু'জনকে সুন্দর মানাবে!

সন্ধ্যেবেলা জয়দেব জিজ্ঞেস করলেন, আজ যে ছেলেটি এসেছিল ওর নাম কী রে?

মান্তু ভুরু তুলে বললেন, ছেলেটি? কোন্ ছেলেটি? অরুণাভ রায়? বাবা, তুমি কী আশ্চর্য, অত বড়ো একজন লোক, তাকে তুমি ছেলে বলছো? তোমার চোখে কি সবাই বাচ্চা? তুমি এমন কিছু বুড়ো হওনি!

জয়দেব হাসতে হাসতে বললেন, তোর বন্ধু তো, সেই জন্যই ছেলে বল-লুম। রাস্তায় ঘাটে এমনি দেখলে ভদ্রলোক বলতুম!

মান্তু একই রকম বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, আমার বন্ধু? তুমি পাগল হয়েছো? উনি অরুণাভ রায়, কতো বড়ো নামকরা লোক, উনি যে নিজে আমাদের বাড়িতে আসবেন, আমি প্রথমে চোখে দেখেই বিশ্বাস করতে পারিনি। আমার সঙ্গে একদিন মাত্র আলাপ হয়েছিল।

—খুব নামকরা লোক? সিনেমা করেন বুঝি?

—বাবা, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না! সিনেমার লোকের সঙ্গে আমি আলাপ করতে যাবো কেন, আর তারাই বা কেন আমাদের

বাড়িতে আসবে ? অরুণাভ রায় খুব বড়ো একজন কবি, 'যৌবন' পত্রিকার সম্পাদক, তোমরা তো কিছু পড়ো না, তাই নাম জানো না ! ওঁকে নিয়ে আমাদের এই গলি থেকে বেরুতেই একটি ছেলে ওঁর কাছে অটোগ্রাফ চাইলো !

জয়দেব সত্যিই অরুণাভ রায়ের নাম শোনেন নি। 'যৌবন' পত্রিকাও চোখে দেখেন নি।

তিনি এবারে মেয়েকে একটু ধমক দিয়ে বললেন, তা ওরকম একজন নামকরা লোক বাড়িতে এসেছিলেন, আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলি না কেন ?

—তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে তুমি কী কথা বলতে ? তুমি তো ওর একটা লেখাও পড়োনি ? তুমি ওর নাম শুনে চিনতে পারবে না, উল্টো পাল্টা কী সব বলে ফেলতে···

হিমানী শ্লেষের সঙ্গে বললেন, কবিদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে সব সময় বুঝি কবিতার কথা বলতে হয়, অন্য কোনো বিষয় নিয়ে ওঁরা কথা বলেন না !

জয়দেব বললেন, আমি ঠিক কথা বলতে পারতুম ! জানিস, একসময় আমিও কবিতা লিখতুম ?

—বাবা ? তুমি ? কবিতা লিখতে ?

মান্তু এবারে হেসে সারা শরীর দোলাতে লাগলো। যেন এরকম মজার কথা সে সারা জীবনে শোনে নি। বাবা শ্রেণীর লোকেরা কবিতা লিখবে, এরকম অবিশ্বাস্য ব্যাপার যেন হয় না। তার ধারণা, কবিরা চিরযৌবনের প্রতীক, তারা কখনো বাবা বা জ্যাঠামশাই হয় না।

জয়দেব বললেন, তুই বিশাস করছিস না ? সত্যি আমি কবিতা লিখেছি।

—তুমি সারা জীবন রেলের চাকরি করে এলে, তুমি কবিতা···

—রেলে চাকরি করলে বুঝি কবিতা লেখা যায় না ? তোর মাকে জিজ্ঞেস করে ছাখ !

হিমানী এই সময় ব্যস্ততার ভান দেখিয়ে বললেন, যাঃ, যত সব পাগলের

কাণ্ড!

বিয়ের পর চাকরি জীবনে প্রথম ট্রান্সফার হয়ে আদ্রা জংশনে থাকার সময় জয়দেব মেঘদূতের যক্ষের স্টাইলে হিমানীকে লম্বা লম্বা কবিতায় চিঠি লিখতেন। সে চিঠিগুলো হিমানী নষ্ট করেন নি। কয়েকদিন আগেও বড়ো ট্রাঙ্কটা গোছাবার সময় সেই পত্র-কাব্য বেরিয়ে পড়েছিল। জয়দেব সেগুলি পড়ছিলেন আর হিমানী বারবার তাড়া দিয়ে বলছিলেন, এই, কী করছো কী, ওগুলো ভেতরে রেখে দাও, ছেলে-মেয়েরা দেখে ফেলবে!

পরদিন তুপুরে, যদিও বসবার ঘরে কেউ নেই, তবু অনেকটা চোরের ভঙ্গিতে জয়দেব মান্তুর খাতাপত্র ঘাটতে লাগলেন। হ্যাঁ, তিনি ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন, মান্তু কবিতা লেখে, তার তু'খানা খাতা ভর্তি শুধু কবিতা। পাতা উল্টে উল্টে সেগুলো তিনি পড়লেন অনেকক্ষণ ধরে, কিন্তু কিছুই প্রায় বুঝতে পারলেন না। এসব আধুনিক কবিতা, ছন্দ নেই, মিল নেই, মাথামুণ্ডু কিছুই নেই মনে হয়, কারা এসব পড়ে কে জানে! তবু পড়তে পড়তে জয়দেব গভীর বিস্ময় বোধ করতে লাগলেন। এই সব অদ্ভুত, জটিল সব বিষয়, চিন্তা, শব্দ মান্তুরই তো মাথা থেকে বেরিয়েছে। যতই বড়ো বড়ো ভাব করুক, মান্তু তো এখনও ছেলেমানুষই, ভূতের গল্প শুনলে বা পড়লে রাত্তিরবেলা একা একা বাথরুমে যেতে ভয় পায়, পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবার আগের দিন এখনও কেঁদে কেঁদে চোখ ফোলায়, পাগলের মতন আচার খেতে ভালবাসে, সেই মান্তুর একটা আলাদা চিন্তার জগৎ আছে, যা বাবা হয়েও জয়দেব কিছুই জানেন না।

কখন লেখে মান্তু এসব কবিতা? এক একদিন মান্তু অনেক রাত জেগে পড়ে, সেই পড়াশুনো করার নামেই সে এসব লিখে লিখে পাতা ভরায়। মান্তুর কবিতা কি ছাপা হয়েছে কোথাও? নইলে আধুনিক কবি অরুণাভ রায় দেখা করতে এলো কেন মান্তুর সঙ্গে?

মান্তুকে এই কথাটা জিজ্ঞেস করতে হবে অনেক কায়দা করে। জয়দেব

লুকিয়ে লুকিয়ে মান্তুর কবিতার খাতা দেখেছেন, এটা জানতে পারলে মান্তু রেগে আগুন হবে।

হুপুরবেলা হিমানী সিনেমা দেখতে গেলেন তাঁর বোনের সঙ্গে। হুপুরে জয়দেবের আর কাটতে চায় না কিছুতেই। তাঁর হুপুরে ঘুমোনো অভ্যেস নেই, কিন্তু সিনেমা দেখতে গেলেই তাঁর চোখ জুড়ে রাজ্যের ঘুম নেমে আসে, সেই জন্য হিমানী তাঁর স্বামীকে সিনেমায় নিয়ে যেতে চান না! তা ছাড়া বাড়ি পাহারা দেবারও ব্যাপার আছে!

ফাঁকা বাড়ি, দোতলার বাড়িওয়ালারাও পুরীতে বেড়াতে গেছে, রাস্তায় আজ কোনো ফেরিওয়ালার ডাকও শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। নাতি হু'টোও বাড়িতে নেই। জয়দেব যেন কোনোদিন এমন একা বোধ করেন নি। একবার তিনি এ ঘরে গিয়ে বসছেন, আবার অন্য ঘরে যাচ্ছেন। হঠাৎ তাঁর মাথায় একটা চিন্তা খেলে গেল!

বড় ট্রাঙ্কটা খুলে তিনি পুরোনো চিঠিগুলি আবার পড়তে লাগলেন। মোট আটখানা কবিতা। তখন জয়দেবের বয়েস ছিল সাতাশ আর হিমানীর একুশ। পড়তে পড়তে মৃহু মৃহু হাসতে লাগলেন জয়দেব। তাঁর মনে পড়ে গেল, এক রাত্তিরেই তিনি হিমানীকে তিনখানা চিঠি লিখেছিলেন।

এই কবিতাগুলো ছাপানো যায় না? হিমানীর নামটা বাদ দিয়ে দিতে হবে অবশ্য। কিন্তু কবিতাগুলো মোটেই খারাপ হয়নি, যা সব লেখা হচ্ছে আজকাল, সেই তুলনায় লোকে এই কবিতা পড়ে মানে বুঝবে, আনন্দ পাবে।

সাদা কাগজ নিয়ে জয়দেব হুটি চিঠির কবিতা কপি করলেন। তারপর একটা নতুন কবিতা লিখে ফেললেন। নিজের এই ক্ষমতায় নিজেই অবাক হলেন তিনি। বাঃ বেশ এসে যাচ্ছে তো লাইনগুলো, প্রায় তিরিশ-বত্রিশ বছর তিনি বাংলায় প্রায় কিছুই লেখেন নি। কিন্তু ভুলে যান নি কিছুই। ইস্কুল-কলেজে তিনি বাংলায় ভালো ছাত্র ছিলেন,তঁ ার বানান ভুল হয় না।

নতুন কবিতাটি লেখা সবে শেষ করেছেন, এই সময় বেল বেজে উঠলো। যমজ নাতি দুটিকে নিয়ে তাঁর পুত্রবধূ দু'দিন আগে বাপের বাড়ি গিয়েছিল, তার বাপের বাড়ি পাশের পাড়াতেই, সে বোধহয় ফিরে এসেছে।
জয়দেব দরজা খুলে অবাক হলেন, মান্তু। সে কোনোদিন এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে না। মেয়েটার শরীর খারাপ হয়নি তো?
মান্তু ভালো করে উত্তর দিতো না বাবার প্রশ্নের। সে খুব অন্যমনস্ক। ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস বন্ধ হয়ে গেছে, তাই সে ফিরে এসেছে।
জয়দেব হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কফি হাউসে আড্ডা দিতে গেলি না?
মান্তু গম্ভীরভাবে বললো, নাঃ।
বেশ কিছুক্ষণ মান্তু বাথরুমে সময় কাটালো, তারপর বেরিয়ে সে দু'কাপ চা বানালো। জয়দেব আবার লিখতে বসেছিলেন। চায়ের কাপ নিয়ে তিনি মান্তুকে ঢুকতে দেখে তাড়াতাড়ি লেখার ওপর একটা বই চাপা দিলেন।
চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে, মান্তু, তোর বন্ধু ঐ যে অরুণাভ রায় 'যৌবন' বলে পত্রিকা বার করেন, সেই পত্রিকা একটাও আছে তোর কাছে?
মান্তু বললো, হ্যাঁ, অনেক আছে।
—কোথায় রেখেছিস? একটু দিবি আমাকে, পড়ে দেখবো!
—ও তোমার ভালো লাগবে না!
—কেন ভালো লাগবে না? বুড়ো হয়েছি বলে কি যৌবনের কথা পড়তে ভালো লাগে না? বুড়ো বয়েসের চেয়ে যৌবনের কথা চিন্তা করতেই তো ভালো লাগে।
—সেজন্য নয়। ওসব লেখা অন্যরকম। বাবা, একটু বাদে আমি আবার বেরুবো, ফিরতে ফিরতে হয়তো আটটা ন'টা বেজে যাবে। তোমরা চিন্তা করো না!
—কোথায় যাবি রে?

বাবার দিকে কয়েক পলক চেয়ে রইলো মান্তু। মিথ্যে কথা তার মুখে দিয়ে বেরোয় না। আবার এমন অনেক কথা থাকে, যা বাবা-মাকে বলা যায় না বা বলার কোনো মানে হয় না।

—দু'একজন বন্ধুর সঙ্গে হাওড়ায় শালকে-তে যাবো।

—শালকে যাবি ? কেন, হঠাৎ ? ওটা কি একটা বেড়াবার জায়গা হলো ?

—বেড়াতে নয়, একটা মিটিং আছে।

—মিটিং ? কিসের মিটিং ! তুই পলিটিক্স করছিস নাকি ? যাসনি তো আগে কোনোদিন।

—সেরকম মিটিং নয়। এটা সভা, মানে সাহিত্যসভা।

—অরুণাভ রায় সেখানে যাবে ?

—ইয়ে, হ্যাঁ, উনিও যাবেন, হঠাৎ ওঁর কথা জিজ্ঞেস করছো ?

—ওকে দেখে আমার খুব আনন্দ হয়েছে। অরুণাভ রায় ওখানে কবিতা পড়বেন বুঝি ?

—হ্যাঁ। অরুণাভ রায়ের একটা সম্বর্ধনা হবে। উনি কবিতা পড়বেন, আরও অনেকে পড়বে।

—চল না। আমিও তোর সঙ্গে যাই। একটু দেখে আসি !

এইবার মান্তুর রেগে ওঠার পালা। সবচেয়ে যেটা সে বেশি অপছন্দ করে, তা হলো অবিশ্বাস। একটু দেখে আসি মানে ? বাবা কি ভেবেছেন সাহিত্যসভার নাম করে সে অন্য কোথাও যাচ্ছে ? কিংবা সে একা একা শালকে যেতে পারে না ? সে কি কচি খুকি ?

মান্তুর মেজাজের উপক্রম দেখেই ভয় পেয়ে জয়দেব বললেন, না, না, আমি তা বলিনি, আমি ভাবছিলাম, তোর সঙ্গে গিয়ে আমিও কবিতা শুনবো, আমার ইচ্ছে করে, তুই বিশ্বাস করলি না, আমিও কবিতা লিখেছি এককালে। এখনও লিখতে পারি। আমার একটা কবিতা পড়ে দেখবি ?

মান্তু হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, কই দেখি ?

জয়দেব বসে আছেন বেতের চেয়ারে, একটু দূরে দাঁড়িয়ে কবিতাটা পড়তে লাগলো মান্তু ! বাথরুম থেকে বেরুবার পর তার আলগা করে শাড়ী পরা, চুল সব খোলা, ভুরু দুটো কোঁচকানো।

জয়দেবের বুক ঢিপঢিপ করছে। মান্তু যেন বিচারক, একটু পরেই রায় দেবে। এই মেয়েকে তিনি জন্ম দিয়েছেন যেন বিশ্বাসই করা যায় না। যখন পুঁচকে একরত্তি ছিল, তখন কী কান্নাই কাঁদতো। একবার তিনি মান্তুকে কোলে নিয়ে তাঁর শ্যালিকার বিয়েতে গিয়েছিলেন, মান্তু হিসি করে তাঁর জামা-টামা ভিজিয়ে দিলো···মনে হয় যেন সেদিনের কথা।

কবিতাটি পড়া শেষ করে কোনো মন্তব্য না করে মান্তু সেটি ফিরিয়ে দিলো।

জয়দেব ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কেমন হয়েছে রে ? ছাপালে লোকে পড়বে না ?

মান্তু বললো, তোমাদের আমলে যে-সব পত্রিকা ছিল, প্রবাসী, বসুমতী, ভারতবর্ষ, সে সব পত্রিকা থাকলে বোধহয় ছাপা হতো । কিন্তু সেরকম পত্রিকা তো এখন আর নেই। কে ছাপবে ?

—কেন, তোদের ঐ অরুণাভ রায়ের পত্রিকায় দিলে ছাপাবে না ?

—না !

—তুই কী করে জানলি ছাপাবে না ? আমি অরুণাভ রায়কে দেখাবো? তুই বলতে চাস একেবারেই ভালো হয়নি ?

—ভালো হয়নি তা তো বলছি না, বাবা ! হ্যাঁ, ভালো হয়েছে। তুমি তো বেশ ছন্দ-টন্দ জানো দেখছি। কিন্তু এখনকার কবিতা অন্যরকম। তোমার কবিতা রাবীন্দ্রিক স্টাইলের, ওসব এখন অচল !

—তুই বললেই হলো অচল ! রবীন্দ্রনাথ অচল !

—রবীন্দ্রনাথ অচল তা তো বলি নি। কালিদাস কি অচল ? তাও না। কিন্তু কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথের স্টাইলের এখন আর লেখা চলে না।

—আমি যদি তোদের শালকের সভায় আমার কবিতা পড়ে শোনাই, দেখবো লোকে কী বলে ?

—বাবা, তোমার ওখানে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

—কেন, একটা সভা হচ্ছে সেখানে সবাই যেতে পারে না ? কেউ যদি কবিতা পড়তে চায়।

—ঠিক আছে তা হলে তুমি যাও, আমি যাবো না!

কয়েক মুহূর্ত থেমে গিয়ে মান্তুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন জয়দেব! তাঁর বুক অভিমানে ভরে গেল। মেয়ের মুখের বকুনি তিনি কোনোদিন সিরিয়াসলি নেননি। সব সময় কৌতুকই বোধ করেছেন, কিন্তু আজ যেন মান্তুর গলায় একটা তিক্ততা ফুটে উঠেছে!

তিনি আস্তে আস্তে বললেন, ও, আমি সঙ্গে গেলে তোর বুঝি অপমান হবে ? ঠিক আছে, আমি যাবো না, তুই যা!

মান্তুর চোখ জলে ভরে গেল। ঝোঁকের মাথায় সে বেশি কঠিন সুরে কথা বলে ফেলেছে বাবার সঙ্গে। কিন্তু কি করে সে বাবাকে বোঝাবে ? সে, উজ্জয়িনী সেন, শালকিয়ার একটি সাহিত্য সভায় যাবে, স্বয়ং অরুণাভ রায় তাকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন, সেখানে সে আজ কবিতা পড়বে, সেখানে কি সে তার বাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারে ? সবাই হাসাহাসি করবে না ? তার ওপর, বাবা যদি সেখানে গিয়ে নিজের ঐ অদ্ভুত কবিতা পড়ার বায়না ধরেন···তা হলে তারপর সে আর কারুর কাছে মুখ দেখাতে পারবে ?

তার বাবা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাবা, তিনি মান্তুকে কত স্বাধীনতা দেন, কত ভালবাসেন, কিন্তু তা বলে বাবাকে তো সে কবি হিসেবে মেনে নিতে পারে না! বাবা যদি অরুণাভ রায়কে ঐ সব কবিতা ছাপার জন্য বিরক্ত করেন, তা হলে অরুণাভ রায় ভয়ে আর এদিক মাড়াবেন না, মান্তুকে এড়িয়ে চলবেন, মান্তুর লেখাও ছাপবেন না।

মান্তুকে কাঁদতে দেখে জয়দেব এবারে কড়া গলায় বললেন, ঠিক আছে, বলছি তো, আমি যাবো না। তুই যা, যখন খুশী ফিরিস, আমি কিছু বলবো না!

—বাবা—

—আর ন্যাকামি করিস না, মান্তু! এর মধ্যে কাঁদবার কী আছে? না হয় আমি ভুল করে একবার যাওয়ার কথা বলে ফেলেছি! আমার সঙ্গে যেতে তোর অপমান বোধ হবে, তা তো বুঝিনি। আর কোনোদিন বলবো না!

চেয়ার ছেড়ে উঠে চটি ফটফটিয়ে জয়দেব চলে গেলেন রান্নাঘরের দিকে। তাঁকে আর এক কাপ চা খেতে হবে, তিনি নিজেই চা বানিয়ে নেবেন।

নিজের ঘরে গিয়ে সাজগোজ শুরু করলো মান্তু। সাড়ে চারটের সময় এস্প্লানেডে মিট করতে হবে, অরুণাভ রায় আরও দু'তিনজন আসবেন, তারপর একসঙ্গে যাওয়া হবে। অরুণাভ রায়ের সঙ্গে একই গাড়িতে, এত বড় সৌভাগ্য···এখন দেরি হয়ে গেছে, ফিরে এসে সে বাবাকে সব বুঝিয়ে বলবে। বাবা যদি লিখতেই চান, তাহলে প্রবন্ধ-ট্রবন্ধ লেখার চেষ্টা করতে পারেন···

সাজ শেষ করে মান্তু বেরিয়ে দেখলো, রান্নাঘরের সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন বাবা, হাতে চায়ের কাপ, ধুতির ওপর গেঞ্জি পরা, কণ্ঠার হাড় দুটি স্পষ্ট, মুখে যেন একটা কালো ছাপ পড়েছে। মান্তুর বুকটা ধক্ করে উঠলো। বাবা যে এত রোগা হয়ে গেছেন, এতদিন যেন সে লক্ষ্যই করেনি। কী অসহায় তাঁর দাঁড়াবার ভঙ্গি, যেন এই পৃথিবীতে তাঁর আর কোনো মূল্যই নেই।

মান্তুর ইচ্ছে করলো তার হাতের খাতাটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে। কোনো দরকার নেই শালকে যাবার, সে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বলবে, বাবা, তুমি রাগ করো না! তোমাকে এরকম ফাঁকা বাড়িতে আমি একা রেখে যেতে পারি? বাবা, তুমি যখন কবিতা লিখতে তখনকার গল্প বলো, তোমার অন্য কবিতাগুলো পড়ে শোনাও, সব কটা পড়ো? বাবা, তুমি রবীন্দ্রনাথকে চোখে দেখেছো? বাবা, তুমি কি মাকে কখনো কবিতা পড়ে শুনিয়েছো? এই রকম গল্প, অনেক গল্প, হবে বাবার সঙ্গে···

কিন্তু সাড়ে চারটে বাজতে আর বেশি বাকি নেই, কথা দেওয়া আছে, অরুণাভ রায়রা দাঁড়িয়ে থাকবে, হয়তো অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবে মান্তুর জন্য, ওদের দেরি হয়ে যাবে···

বাবা, আমি আসছি, বলেই ছটফটিয়ে বেরিয়ে গেল মান্তু।

এগারো বছর পর

গাঢ় নীল রঙের শাল জড়ানো রমণীটিকে দেখেই বুকটা কেঁপে উঠলো বিমানের। প্রায় দশ এগারো বছর পর দেখা, তবু চিনতে একটুও ভুল হয়নি। খুশী হবার বদলে বিমান অবাক হলো বেশি। এখনো ইরাকে দেখে তার বুক কাঁপে? এই চল্লিশ বছরের কঠিন বুক?

বাগডোগরা এয়ারপোর্টে বিমানের থেকে বেশ খানিকটা দূরে বসে আছে মহিলাটি, সঙ্গে একটা ছ'সাত বছরের বাচ্চা। বেশ স্বাস্থ্যবান, দুরন্ত ছেলে, সে একটা বল নিয়ে লাফালাফি করছে, খানিকটা দূরে চলে গিয়েও আবার ফিরে আসছে মায়ের কাছে।

মহিলাটির মুখখানা একপাশে ফেরানো, হাতে একটা বই, কিন্তু সে বই পড়ায় মনোযোগ নেই, মাঝে মাঝেই চোখ তুলে দেখে নিচ্ছে ছেলেকে। অন্য কোনো যাত্রীর দিকে সে তাকাচ্ছে না একবারও। ইরা একবার সোজা তাকালেই বিমানের সঙ্গে তার চোখাচোখি হতো।

বিমানের খটকা লাগলো, এই মেয়েটি কি সত্যিই ইরা? না হুবহু ইরার মতন দেখতে অন্য কেউ! লম্বা চুল পিঠের ওপর ফেলা, ইরার তো এত বড় চুল ছিল না। ইরা চুল কেটে ফেলেছিল, সেই ছোট চুল অবস্থাতেই ইরাকে দেখেছে বিমান। ইরা না হয়ে যদি অন্য মেয়ে হয়, কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের এতটা মিল কি হতে পারে?

ইরা যদি হয়, তার স্বামী কোথায়? অতটুকু বাচ্চাকে নিয়ে কি ইরা একা

একা প্লেনে ট্রাভ্‌ল করে! এ পর্যন্ত কোনো পুরুষের সঙ্গে সে একটাও কথা বলেনি। ওর বাঁ-পাশে যে পুরুষটি বসে আছে, সে মাঝে মাঝে আড় চোখে তাকাচ্ছে, তাতেই বোঝা যায়, সে একটি অচেনা যুবতীকে দেখছে।
প্লেন দেড় ঘণ্টা লেট, শুধু বসে থাকা আর কিছুই করার নেই।
যতজন যাত্রী, তার চেয়ে বসবার জায়গা কম। অনেকে দাঁড়িয়ে আছে, আছে, কেউ একবার উঠে গেলেই. চেয়ারটা বেদখল হয়ে যাবে। তবু বিমান একটা সিগারেট ধরিয়ে ব্রীফকেসটাকে চেয়ারের ওপর রেখে একটু পায়চারি করতে গেল।
জল খাওয়ার জায়গাটায় গিয়ে অন্য দিক থেকে সে দেখলো সেই গম্ভীর নারীকে। না, আর সন্দেহ নেই, নিশ্চয়ই ইরা। অবিকল সেই চিবুকের রেখা।
বিমান ভাবলো, আরে, আরে আমার হৃদপিণ্ডটা এত লাফালাফি করছে কেন? ইরার সঙ্গে হঠাৎ কোনোদিন এভাবে তো দেখা হতেই পারে। ইরাকে ভয় পাবার কী আছে?
ইরার সঙ্গে দুটো-একটা কথা বললে কি সে রাগ করবে? সামান্য ভদ্র-তার কথা? ইরার স্বামী সঙ্গে থাকলে হয়তো পছন্দ করবে না।
ইরা আর চোখ তুলছে না বই থেকে, তাহলে কি সে দেখতে পেয়েছে বিমানকে? সে ইচ্ছে করেই বিমানের দিকে তাকাচ্ছে না!
কিছুই আসে যায় না, ইরার সঙ্গে যে কথা বলতেই হবে তার কী মানে আছে? কে আর হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে? না, বিমানের বুকে কোনো পুরনো দুঃখ পোষা নেই। প্রতিমা বিসর্জন দেবার মতন সে ইহাকে, একদিন ইরাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। মাঝখানে অনেকগুলো বছর!
বাচ্চাটার বলটা একবার বিমানের পায়ের কাছে আসতেই সে নীচু হয়ে তুলে নিল। তারপর বেশ জোরে জিজ্ঞেস করলো, খোকা তোমার নাম কী?
ছেলেটি অচেনা লোককে নাম বলে না। সে বলটা ফেরৎও চাইলো না,

এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো বিমানের দিকে।

ইরা নিশ্চয়ই বিমানের গলার আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। তবু সে চোখ তোলেনি।

বিমান বলটি গড়িয়ে দিলো। থাক, সে আর গায়ে-পড়া ভাব দেখাবে না। এবার নিজের জায়গায় ফিরে যাওয়া ভালো।

বাচ্চাটি বল নিয়ে দৌড়োতে গিয়ে এবার আছাড় খেয়ে পড়ে গেল হঠাৎ! বেশ জোরে। বিমান ছুটে এসে তাকে তুললো।

এবারেও বই থেকে চোখ তুলবে না, এমন কোনো মা হয় না। বই রেখে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, মিঠ, এদিকে এসো!

বাচ্চাটা পড়ে গিয়েও কাঁদেনি। বিমানের কোল থেকে নামবার জন্য সে ছটফট করছে। আজকালকার বাচ্চারা চট করে কাঁদেও না, অন্যো লোকের কাছ থেকে সাহায্যও চায় না।

ইরা তাকিয়ে আছে বিমানের দিকে। সে দৃষ্টিতে কোনো জড়তা নেই, রাগ-দুঃখ-ঘৃণা কিছুই নেই, খুব শান্ত, স্নিগ্ধ সে চাহনি। বিমান প্রতীক্ষা করতে লাগলো, ইরা নিজে থেকেই তাকে কিছু বলবে।

কিন্তু ইরা চোখ সরিয়ে নিল।

মিঠকে নামিয়ে দিয়ে নিজের চেয়ারের দিকে পা বাড়াতে গিয়েও পারলো না বিমান। যেন একটা চুম্বক তাকে টানছে।

ইরার স্বামী যে সঙ্গে নেই, তা এখন নিশ্চিত করে বলা যায়। বাচ্চাটা আছাড় খেতেও কোনো পুরুষ বিচলিত হয়নি।

কাছে এসে বিমান জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছো, ইরা?

ইরা আবার চোখ তুলে তাকালো। কোনো কথা বললো না। বিমানের বুক ঢিপ ঢিপ করছে। ইরা যদি তাকে চিনতে না পারে? কিংবা না চেনার ভান করে? এত লোকের মাঝখানে ইরা তাকে অপমান করবে?

বিমান আবার জিজ্ঞেস করলো, চিনতে পারছো, ইরা? কেমন আছো?

ইরা এবার মৃদু গলায় উত্তর দিলো, ভালো!

বিমানবন্দরে পূর্ব-পরিচিতদের সঙ্গে দেখা হলে সবাই দু'চারটে সাধারণ

কথা বলে। প্রায় এক রকমের কথা।
বিমান জিজ্ঞেস করলো, এদিকে কোথায় এসেছিলে?
বইটা মুড়ে রেখে ইরা ছেলের দিকে ইঙ্গিত করে বললো, ও কার্শীয়াঙের একটা স্কুলে পড়ে। ছুটিতে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।
বিমান বললো, আমি শিলিগুড়িতে এসেছিলুম অফিসের কাজে, অনেক-দিন পর দেখা।
এ কথার কোনো উত্তর হয় না, ইরা নিজে থেকে কোনো প্রশ্নও করতে চায় না। সে মুখ নীচু করলো।
পাশের লোকটাকে কি বিমান জায়গা বদলের প্রস্তাব দেবে? বিমান একবার নিজের ব্রীফকেসটা দেখে নিল। ইরার সঙ্গে সে এখানেই কথা-বার্তা শেষ করে দিতে চায় না।
মিঠু এসে মায়ের পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, এ কে মা?
এইসব ক্ষেত্রে মহিলারা সাধারণত বলে, ইনি একজন কাকু।
ইরা তা বললো না। ছেলেকে বললো, তুমি ওঁর নাম জিজ্ঞেস করো।
যেন ইরা বিমানের নাম জানে না, বিমানের সঙ্গে তার কয়েকমুহূর্ত আগে প্রথম পরিচয়।
বিমান মিঠুর দিকে তাকিয়ে বললো, তোমার নাম জিজ্ঞেস করলুম, তুমি তো বলোনি? আমার নাম কেন বলবো!
এবারে মাইকে একটি ঘোষণা হলো। এক ঘণ্টা পরেও বিমানটি এসে পৌঁছনোর আশা নেই। আবহাওয়া খারাপ। আজকের ফ্লাইট কখন তা অনিশ্চিত।
বৃষ্টি পড়ছে সকাল থেকেই। এক সময় খুব ঝোড়ো হাওয়া দিলো। জমাট মেঘের ওপর তলায় এখনও হয়তো বিশৃঙ্খলা চলছে। এখানে যখন তখন ফ্লাইট বাতিল হওয়া নতুন কিছু নয়।
ঘোষণাটি শুনে অপর যাত্রীদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল। কয়েকজন উঠে গেল পাকা খবর জানতে। একজন আর একজনকে উঁচু গলায় শোনালো, বিকেলের আগে কোনো আশা নেই।

বিমান তার অফিসের গাড়িটাকে অপেক্ষা করতে বলেছে। ফ্লাইট একেবারে ক্যান্সল্ড্ হলে তাকে শিলিগুড়ির হোটেলে রাত কাটাতে হবে। আগেও এমন হয়েছে, আজকের আবহাওয়া দেখে সে মনে মনে খানিকটা তৈরিই ছিল।

বিমান নিজের ব্রীফকেসটা হাতে নিয়ে ফিরে এসে ইবাকে জিজ্ঞেস করলো, বিকেল পর্যন্ত এখানে বসে থাকবে?

ইরা মাথা হেলিয়ে বললো, হ্যাঁ।

চলো একটু কফি খেয়ে আসা যাক।

একটু আগেই খেয়েছি।

এটা কি প্রত্যাখ্যান? একটু আগে ইরাকে কফি খেতে দেখে নি বিমান। অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক আগে খেলেও আব একবার এক কাপ কফি খাওয়া যায়। কিন্তু ইরা খুব ভদ্রভাবে জানিয়েছে, সে খেতে চায় না।

সে মিঠুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, তুমি আইসক্রিম খাবে? চলো, তুমি আর আমি খেয়ে আসি!

এটাও আর একটা ভুল। আজকালকার বাচ্চারা কিছু খেতেই চায় না, বিশেষত অচেনা লোকের কাছ থেকে। মায়ের অনুমতি জানাব কোনো চেষ্টা না করেই মিঠু মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, না, আমি আইসক্রিম খাবো না।

বিমান বললো, খুব সুন্দর ছেলে হয়েছে তোমার! খুব স্মার্ট!

মিঠু সত্যিই সুন্দর, তাকে দেখলে আদর করতে ইচ্ছে করে। তার আইসক্রিমের প্রতি লোভ নেই।

নিজেকে বেশ বোকা বোকা লাগছে বিমানের। সে আর কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ বিমানবন্দরে সুদীর্ঘ অপেক্ষার সময় সে ইরার সঙ্গে আর কোনো কথা বলবে না?

কর্তৃপক্ষ একটা বোর্ডে লিখে দিয়েছে যে বিকেল সাড়ে চারটের আগে বিমানটি আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। দমদমের আবহাওয়াও আজ ভালো নয়।

এখন ত্বপুর একটা। সাড়ে তিন ঘণ্টা এখানে বসে থাকার কোনো মানে হয় ? তাও বিমানের ধারণা, আজকে ফেরার আশা খুবই কম। শীতের বিকেল এখানে খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। সন্ধ্যার পর এখান থেকে প্লেন ছাড়ার দৃষ্টান্ত খুবই কম। বাগডোগরা ফ্লাইট যখন তখন ক্যানসেল করতে দমদম থেকে দ্বিধা করে না।

ইরার পাশের লোকটি এতক্ষণে উঠে গেছে। বিমান একটু এগিয়ে এসে বললো, তোমার পাশে একটু বসতে পারি ?

ইরা মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মতি জানালো।

হলের ভিড় পাতলা হয়ে গেছে, অনেকেই চলে গেছে বাইরে। বল খেলা থামিয়ে একটু দূরের একটা চেয়ারে পা তুলে বসে মিঠু একটা কমিক্স-এর বই খুলেছে।

বিমান জিজ্ঞেস করলো, এত ছোট ছেলেকে হোস্টেলে রেখে পড়াচ্ছো ? ওকে এখানে পৌঁছে দেওয়া, এখান থেকে নিয়ে যাওয়া, সব তুমিই কর ? ওর বাবা আসেন না !

এতক্ষণ বাদে একটু হেসে ইরা বললো, কেন, মায়েরা বুঝি পারে না ? এমন কিছু শক্ত কাজ ?

না, তা বলছি না ? ধরো, আজ যদি প্লেন একেবারেই না যায় ? রাত্তিরে তোমরা থাকবে কোথায় ?

এরা নিশ্চয়ই একটা কিছু ব্যবস্থা করবে। না হলে অনেক হোটেল আছে···

ঝট করে একটা কথা বিমানের মনে পড়ে গেল। সে এখানে মাসে অন্তত তুবার যাতায়াত করে। সবচেয়ে বড়ো হোটেলটি তার চেনা। সে নিজে তো ঘর পাবেই, ইরা আর তার ছেলের জন্যও ব্যবস্থা করে দিতে পারে। আজ প্লেনটা না ছাড়লেই ভালো।

বিমান জিজ্ঞেস করলো, মিঠুর বাবা কোথায় আছেন ?

অফিসের ভাষায় প্রশ্নটা করেছিল বিমান। সে জানতে চেয়েছিল, ইরার স্বামী কোন অফিসে, কোন পদে কাজ করে। এটা একটা পেশাদারি

কৌতূহল।

ইরা বললো, ভূপালে।

রীতিমতন অবাক হয়ে বিমান বললো, উনি ভূপালে থাকেন? তোমরা কি এখন সেখানে যাবে?

ইরা বললো, না। আমি কলকাতায় থাকি!

তুমি একলা কলকাতায় থাকো? তাহলে ছেলেকে কাছে রাখোনি কেন?

আমাকে চাকরি করতে হয়, সময় পাই না।

স্বামী থাকে ভূপালে, আর ইরা কলকাতায়। এর মধ্যে কি কিছু রহস্য আছে? চাকরির জন্য স্বামী-স্ত্রীর আলাদা জায়গায় থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু বিমান জানে যে ইরা বাংলা অনার্সের গ্র্যাজুয়েট, সে কলকাতায় এমন কি চাকরি পাবে, যার জন্য স্বামীকে ছেড়ে ইরা এত-দূরে থাকবে?

বিমান নিজেই কলকাতায় ছিল না অনেকদিন, বছর পাঁচেক কাটিয়েছে দিল্লীতে, ছ'মাস লণ্ডনে, তাই ইরার বিয়ের পর অন্য কিছু ঘটে গেছে কিনা সে কিছুই জানে না। ইরা কলকাতায় একা থাকে, ছেলের জন্য মাঝে মাঝেই শিলিগুড়িতে আসে, তবু এর আগে একবারও তার সঙ্গে দেখা হয়নি।

স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়নি তো ইরার। কিন্তু সে কথা কী করে জিজ্ঞেস করা যায়!

মিঃ দাশগুপ্ত, এখানেই বসে থাকবেন নাকি?

ঘাড় ঘুরিয়ে একটু ফ্যাকাসে ভাবে হেসে বিমান বললো, এই-ই, কী আর করা!

ওভারকোট পরা লোকটি বললো, আজ না যেতে পারলে এমন অসুবিধে হবে, মিঃ আগরওয়ালের সঙ্গে জরুরি দরকার আছে···আপনি ফিরেই প্যাকিং বক্সের অর্ডারটা···লোকটি কথা বলছে বিমানের সঙ্গে, চোরা চোখে তাকাচ্ছে বিমানের দিকে।

বিমান বিরক্তি গোপন করলো। লোকটি একটি চা বাগানের ম্যানেজার,

একে অগ্রাহ্য করা যায় না, এর সঙ্গে অফিসের কাজের সম্পর্ক আছে। আজ সকালেই এর সঙ্গে এক ঘণ্টা ধরে নানা বিষয়ে আলোচনা করেছে বিমান, নতুন কিছু আর বলার নেই।

এক ধরনের লোকের স্বভাবই এই রকম, কোনো মেয়ের সঙ্গে চেনা কারুকে কথা বলতে দেখলেই তার কাছে এসে দাঁড়ায়। লোকটি অফিসের কাজের কথা বলার ছুতোয় ইরাকেই দেখে যাচ্ছে শুধু।

ইরা নিশ্চয়ই বিরক্ত হচ্ছে, বিমান চেয়ার ছেড়ে উঠে একটু দূরে চলে গেল। কফি খেতে গিয়ে মিনিট পনেরো কাটিয়ে, লোকটিকে অন্য এক-জনের কাছে সঁপে দিয়ে সে ফিরে এলো আবার।

এরা এখন মন দিয়ে বই পড়ছে। চেহারা বিশেষ বদলায়নি ইরার। শুধু মুখে যেন সামান্য ম্লান ভাব। বিবাহিত জীবনে কি সে সুখী হয়নি?

ইরার সঙ্গে সে রকম কিছু খারাপ ব্যবহার করেনি বিমান। কোনো প্রতিশ্রুতি ভাঙেনি। এক সময় তারা খুব কাছাকাছি এসেছিল। খুব চাপা ধরনের মেয়ে ছিল ইরা, তার মনের ভাব বোঝা শক্ত ছিল, কিন্তু সে যে বিমানকে পছন্দ করতো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ওরা ঠিক ভালো-বাসার কথা বলেনি কোনোদিন, তবে পরস্পরের ভালো লাগার ব্যাপার ছিল অনেক।

মাত্র একটি দিনের ঘটনায় ইরা অনেক দূরে সরে যায়। এত যে তীব্র অভিমানী মেয়ে সে, তা কী করে বুঝবে বিমান? ইরা কোনোদিন কোনো অভিযোগ করেনি, ঝগড়াও করেনি, তবু তাদের দু'জনের মধ্যে একটা ফাটল এসে গেল।

সে বছর চাটার্ড অ্যাকাউনটেন্সি শেষ করছে বিমান। গাড়ি চালানো শিখছিলো। গাড়ি চালানোর নেশা ধরে গিয়েছিলো। দাদার গাড়িটা নিত মাঝে মাঝে, কিন্তু দাদা সেটা পছন্দ করতেন না। গাড়ির ব্যাপারে খুঁত-খুঁতে ছিলেন দাদা, তার গাড়িতে অন্য কেউ হাত দিলে বিরক্ত হতেন। অফিসের কাজে দাদার বম্বে যাবার কথা হয়েছিল একবার। বিমান ঠিক করে রেখেছিল, দাদা চলে গেলেই একদিন সে গাড়িটা নিয়ে

দূরের ড্রাইভে যাবে। ইরাকে নিয়ে ডায়মণ্ডহারবার! সকালবেলা বেরিয়ে সন্ধেবেলা ফিরে আসা, সারাদিন ইরার সঙ্গে কাটানো যাবে।

ইরাকে সব বলা হয়ে গিয়েছিল, ইরাও রাজি হয়েছিল। ইরা চেয়েছিল, কাকদ্বীপ পর্যন্ত ঘুরে আসবে। ইরার ধারণা কাকদ্বীপ সত্যি সত্যি একটা দ্বীপ।

দাদার বম্বে যাওয়ার সব ঠিকঠাক, কিন্তু তার দু'দিন আগেই শিলং থেকে বড়দির মেয়ে দীপা আর তার বান্ধবী ইলোরা চলে এলো কলকাতায় তাদের বাড়িতে। কনভেন্টে পড়া মেয়ে, ওদের ব্যবহারে কোনো আড়ষ্ঠতা নেই, দারুণ হৈচৈ করতে ভালবাসে। বাড়ির ছোট ছেলে বিমানের ওপরই ভার পড়লো ওদের কলকাতা ঘুরিয়ে দেখাবার।

মঙ্গলবার কিসের যেন একটা ছুটির দিন, সেদিনই ইরাকে নিয়ে বিমানের ডায়মণ্ডহারবার যাওয়ার কথা। কিন্তু দীপা আর ইলোরাকে কিছু না জানিয়ে সারাদিন বিমান বাড়ির বাইরে থাকবে কী করে? বিশেষত গাড়িটা নিয়ে গেলে ওরা জানতে চাইবেই।

একমাত্র উপায় দীপা আর ইলোরাকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়া। ওরা কলকাতায় বেড়াতে এসেছে, ওদের ভালো লাগবে নিশ্চয়ই।

ডায়মণ্ডহারবার নামটা উচ্চারণ করা মাত্র দীপা আর ইলোরা প্রায় এক-সঙ্গে বলে উঠলো, ওদের সেখানে নিয়ে যেতেই হবে।

মঙ্গলবার সকাল আটটায় ইরার সঙ্গে যাওয়ার কথা ঠিকঠাক হয়ে আছে। ইরাকে বাড়ি থেকে তুলে নিতে হবে। গাড়িতে অন্য দুটি মেয়েকে দেখে ইরা যাতে চমকে না যায়, সেইজন্য ঘুম থেকে উঠেই বিমান ফোন করেছিল ইরাকে। কাচুমাচু মুখে বলেছিল, আমার ভাগ্নী আর তার এক বান্ধবীও যেতে চাইছে, এমন মুস্কিল, কিছুতেই এড়াতে পারছি না, কী মুস্কিল বলো তো ভেবেছিলুম শুধু তোমাকে নিয়ে···

উত্তর দিতে একটু দেরি করেছিল কি ইরা? কিন্তু তার কথা শুনে ভরসা পাচ্ছিল বিমান। একটুও রাগ করেনি ইরা, হেসে বলেছিল, বাঃ ভালোই তো, ওরা সঙ্গে গেলে একসঙ্গে বেশ মজা করা যাবে। আচ্ছা, আমি

ওদের সামনে সিগারেট খেলে কি ওরা কিছু মনে করবে ?

বিমান বলেছিল, না না, ওরা দারুণ স্মার্ট, ওরাও হয়তো সিগারেট খায়-টায় ! আচ্ছা, তাহলে তুমি রেডি হও, ঠিক আটটার সময় তুলে নিচ্ছি !

কিন্তু ইরা এলো না। তার বাড়ির সামনে গাড়ি থামতেই ওদের বাড়ির বাচ্চা কাজের মেয়েটি এসে একটা চিরকুট দিলো। ইরা লিখেছে যে তার খুব মাথা ধরেছে, সে আজ যাবে না।

ইরা একবার দেখা করতেও এলো না। বিমান ওপরে গিয়ে শুনলো, ইরা বাথরুমে।

মাথা ধরলে কি গাড়িতে বেড়াতে যাওয়া যায় না ? ওষুধ খেলেই তো মাথা ধরা সেরে যায়। অতি তুচ্ছ একটা অজুহাত দেখিয়েছিল ইরা। এইটুকু সময়ের মধ্যে মত পাল্টে ফেলেছিল ইরা !

পরে এই নিয়ে বিমান মাঝে মাঝে ভেবেছে, কেন সেদিন গেল না ইরা ? হয়তো সে একা একা বিমানের সঙ্গে ডায়মণ্ডহারবার বেড়াবার কিছু স্বপ্ন দেখে ফেলেছিল আগে, সঙ্গে অন্য কেউ থাকলে সেই স্বপ্নের সঙ্গে মিলবে না, সেই জন্যই ইরা যেতে চায়নি। এইরকমই রোমান্টিক স্বভাব ছিল তার।

শুধু সেদিন না, তারপর সাতদিন আর ইরার সঙ্গে দেখাই হলো না। দীপা আর ইলোরাকে নিয়ে সিনেমা-থিয়েটার দেখা, আড্ডা, আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাওয়া। বিমান ঠিক করেছিল, ওরা চলে যাবার পর সে আবার দেখা করবে ইরার সঙ্গে।

দীপা আর ইলোরা হঠাৎ খুব জোর করলো বিমানকেও ওদের সঙ্গে শিলং যাবার জন্য। দীপা একেবারে নাছোড়বান্দা। বিমানের তখন ছুটি, মা বললেন, যা না, দিদির কাছ থেকে ঘুরে আয়, আমি ভাড়া দিচ্ছি। বিমানের না বলার উপায় ছিল না। শিলং বেড়াতে যাবার ইচ্ছেও ছিল তার অনেকদিনের। যাবার সময়েও সে ইরার সঙ্গে দেখা করে যেতে পারেনি। কিংবা ইরাই ইচ্ছে করে এড়িয়ে গিয়েছিল তাকে ? টেলি-ফোনে ইরাকে পাওয়া যায়নি।

শিলং থেকে চেরাপুঞ্জী যাবার পথেই বিমান বুঝতে পারতো, ইলোরা মেয়েটিকে সে এতোটাই পছন্দ করে ফেলেছে, যা প্রায় ভালবাসার কাছাকাছি। প্রবল বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সে ইলোরাকে চুমু খেলো।

ইরাকে সে কখনো চুমু খায়নি, দু'একবার ইচ্ছে প্রকাশ করতেও রাজি হয়নি ইরা, তার প্রত্যাখানের কারণ ছিল লজ্জা। যদি কেউ দেখে ফেলে কিংবা বুঝতে পারে। হয়তো ডায়মণ্ডহারবার গেলে, নিরালায়, অতখানি রাস্তা একসঙ্গে···।

ইরার সঙ্গে তার বিচ্ছেদের মাঝখানে কোনো রকম রাগারাগি, মন কষা-কষি হয়নি। এর পরেও কয়েকবার দেখা হয়েছে ইরার সঙ্গে, সে কোনো অভিযোগ করেনি, তার ব্যবহার ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, সে আর বিমানের সঙ্গে একলা সময় কাটাতে রাজি হতো না।

বিমান তো ইরাকে ভালবাসার অঙ্গীকার দেয়নি, বিয়ে-টিয়ে করার কোনো কথাই ওঠেনি, তবু ইরা সম্পর্কে একটা অপরাধবোধ জমে ছিল তার মনের মধ্যে। যেন সে কিছুটা অন্যায় করেছে। এতদিন পরেও সেটা যায়নি।

বাইরে বৃষ্টি নেই বটে কিন্তু হাওয়া দিচ্ছে শন শন করে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে মাঝে মাঝে। সেই দিনটাও ছিল অনেকটা এইরকম।

ইরার কাছে এসে বিমান বললো, একটা কথা বলবো?

ইরা মুখ তুলে তাকালো। বড়ো বড়ো চোখ দুটি খুব শান্ত, স্নিগ্ধ।

বিমান খানিকটা আবেগের সঙ্গে বললো, ইরা, দু'তিন ঘণ্টা এখানে বসে থেকেও তো কোনো লাভ নেই। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে, চলো আমরা শিলিগুড়িতে ফিরে যাই, প্লেন আসবে কিনা ওখান থেকে ফোনে খবর পেয়ে যাবো!

ইরা জিজ্ঞেস করলো, শিলিগুড়িতে···কোথায়?

বিমান বলতে যাচ্ছিল, শিলিগুড়িতে যে কোনো বড়ো হোটেলে গিয়ে বললেই তাকে তারা ঘর খুলে দেবে। সেখানে বিশ্রাম নেওয়া যায়। কিন্তু হোটেলের কথাটা উচ্চারণ করতে তার বেশ লজ্জা করলো। একটি

যুবতী মেয়েকে হোটেলে নিয়ে যাওয়া বলতে অন্য কিছু বোঝায়। সে বললো, আমরা গাড়ি নিয়ে খানিকটা বেড়িয়ে আসতে পারি। লং ড্রাইভে, ধরো করোনেশান ব্রীজ ছাড়িয়ে···ওদিকটা কি তুমি দেখেছো? তোমার ছেলেরও ভালো লাগবে!

কোনো উত্তর দিলো না ইরা, বেশ কয়েক পলক এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। তারপর একটা অভাবিত কাণ্ড ঘটলো। হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ইরা। মাটিতে তার মাথা ঠোকার শব্দ হলো খটাস করে। ইরা অজ্ঞান হয়ে গেছে!

একটা হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল। এতক্ষণ বাদে কেঁদে উঠলো মিঠু। যাত্রী-দের মধ্যে দু'একজন চেঁচিয়ে উঠলো, ডাক্তার, ডাক্তার! কেউ ডাক্তার আছেন এখানে।

একজন ডাক্তার পাওয়া গেল কাছেই। দু'জন মহিলা যাত্রী ইরাকে তুলে ধরাধরি করে নিয়ে গেলেন এয়ারলাইন্সের অফিসঘরে। সেখানে ভিড় জমালো অনেকে। বিমান এমনই হতভম্ব হয়ে গেছে যে তার মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরুচ্ছে না। একজন জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার, ভদ্র-মহিলার মৃগী রোগ আছে নাকি? বিমান নিঃশব্দে মাথা নাড়লো।

ডাক্তারটি একটু বাদে বেরিয়ে এসে বললেন, চিন্তার কিছু নেই। হঠাৎ কোনো কারণে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন।

সিগারেট ধরাতে গিয়ে বিমানের হাত কাঁপছে। সে-ই কি দায়ী? সে বেড়াতে যাবার প্রসঙ্গটা তুলতেই জ্ঞান হারিয়ে ফেললো ইরা? দশ এগারো বছর পরে, বিমান ভেবেছিল, একসঙ্গে দুজনে বেড়াতে গেলে সম্পর্কটা আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে। অবশ্য মিঠু থাকতো···। মিঠুর জন্যই কি ইরা যেতে চাইলো না?

মেঘ সরে গেল আকাশ থেকে, ফিনফিনে হাওয়া বন্ধ হলো, প্লেন এবার ঠিক এলো সাড়ে চারটের সময়। ইরা এখন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেছে। মিঠুর হাত ধরে সে চলে গেল সিকিউরিটি এরিয়ার মধ্যে। আর একবারও তাকালো না বিমানের দিকে।

দৈববাণী

একটা শান্ত, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, পারিবারিক পরিবেশ তছনচ করে দিলো একটা টেলিফোন।

রাত সাড়ে ন'টা, সদ্য টি ভি প্রোগ্রাম শেষ হয়েছে, এবার নৈশ ভোজের সময়। টি ভি থামবার পর মিনিট পাঁচেক অখণ্ড নিস্তব্ধতা। তারপর মিংকা তার নিজের পছন্দ মতন রেকর্ড বাজাতে শুরু করে স্টিরিওতে। টি ভি'র ইংরিজি খবরটা শোনার পর সুরজিৎ হুইস্কির গ্লাস হাতে নিয়ে চলে যায় বারান্দায়, এখন তার আকাশ দেখার সময়। সুমিত্রা চলে যায় বাথরুমে শরীর জুড়োতে, রান্নাঘরে আলু ভাজার শব্দ।

এই সময় বেজে উঠলো টেলিফোন।

কে টেলিফোন ধরবে, তা ঠিক করার আগে চার পাঁচবার বাজে। সুরজিৎই আকাশের তারাদের থেকে চোখ ফিরিয়ে বসবার ঘরে এসে রিসিভারটা তোলে। সে হ্যালো বলার সঙ্গে সঙ্গে লাইন কেটে যায়।

সুরজিৎ কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আবার বারান্দায় ফিরে আসে। বেনিফিট অব ডাউট দেওয়া যেতে পারে। লাইন পেলেও যেকোনো মুহূর্তে কানেকশন কেটে যাওয়া কলকাতা শহরে খুব আশ্চর্য কিছু নয়! আবার এমন হতে পারে, মিংকার কোনো ছেলে বন্ধু টন্ধু···মিংকার বয়েস এখন সতেরো।

এক মিনিট পরেই আবার টেলিফোন বাজলো।

সুরজিৎকে কিছু বলতে হলো না, মিংকাই চেঁচিয়ে বললো, আমি ধরছি, বাপি!

এবারও বাজলো পাঁচবার। মিংকা রিসিভার তুলেই বিরক্তির সঙ্গে বললো, যাঃ লাইন কেটে গেল।

বাকি রইলো সুমিত্রা। সাঁইত্রিশ বছর বয়েস, এখনো অনেকেই সুমিত্রাকে মিংকার দিদি বলে ভুল করে। সুতরাং তারও বিশেষ টেলিফোন-বন্ধু থাকা সম্ভব। কিন্তু সুমিত্রা তো মিনিট পনেরোর আগে বেরুবে না বাথরুম থেকে। মিনিট পাঁচেক বাদে তৃতীয়বার টেলিফোন ঝনঝন করতেই সুরজিৎ বাথরুমের দরজায় এসে টোকা দিয়ে বললো, এই!

ভেতরে ধারাজলের শব্দের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কিছুটা অলৌকিক সুরে সুমিত্রা বললো কী?

—তোমার টেলিফোন!

—কে? কে ডাকছে?

—তোমার চার নম্বর প্রেমিক।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র দেরি করে বললো, ধরতে বলো!

কিন্তু তার আগেই মিংকা ধরেছে এবং আবার কেটে গেছে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে সুমিত্রা সুরজিৎকে বললো, প্রায়ই দুপুরবেলা একজন কেউ ফোন করে, আমি ধরলেই লাইন কেটে দেয়। মনে হয় কোনো মেয়ে তোমায় পাগলের মতন খোঁজে।

সুরজিৎ বললো, উইক ডেইজ-এ আমি দুপুরে বাড়িতে থাকবো, একথা যদি কোনো মেয়ে ভাবে, তা হলে সে পাগল তো বটেই।

টেবিলে খাবার দেওয়া হয়ে গেছে। সুরজিৎ আর একটু হুইস্কি নেবে কিনা তাই নিয়ে দোনামনা করছিল, শেষ পর্যন্ত না-নেওয়াই ঠিক করলো। খাওয়া শুরু করার পরই বাজলো আবার টেলিফোন। সুরজিৎ স্ত্রীকে বললো, তোমার টার্ন!

সুমিত্রা এঁটো হাতেই উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরলো। এবার একজন বললো। উঃ কতক্ষণ ধরে লাইনটা পাওয়ার চেষ্টা করছি, কিছুতেই পাওয়া

যায় না, আপনি খবরটা শুনেছেন তো ?

মহিলা কণ্ঠ। সুমিত্রা প্রথমে ঠিক চিনতে পারলো না। পেছন ফিরে স্বামীর দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে সে আবার নরম গলায় বললো, না, কোনো খবর শুনিনি তো। কী হয়েছে ? আপনি···

—আমি মিসেস সেন বলছি, অমিতাভ'র মা।

সুমিত্রা এবার অত্যন্ত বেশী উৎসাহের সঙ্গে বললো, ও, মিসেস সেন, বলুন, কী খবর ?

—মিসেস মৈত্র, এত রাতে আমি ফোন করলুম, আগে অনেকবার চেষ্টা করেছিলুম, মানে আমি ভাবলুম, আপনি যদি খবরটা না শুনে থাকেন।

—কী খবর ?

—অন্ধ্রের ঝড় !

—অন্ধ্রের বর ? কী বললেন ?

—আপনাকে অরিজিৎ কিছু বলে নি ?

বিন্টু অর্থাৎ অরিজিৎ আর কোকো অর্থাৎ অমিতাভ একই স্কুলের ক্লাস এইট-এ পড়ে। এদের দু'জনের মায়ের মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে স্কুলের টিফিনের সময়, এক সঙ্গে ফিরেছেও কয়েকবার। এবং এর বাড়ি ও ওর বাড়িতে দু'বার দুটি নিমন্ত্রণও হয়েছিল। পরস্পরের কাছে এদের পরিচয় অরিজিতের মা আর অমিতাভ'র মা, কিন্তু এই পরিচয় অনেকটা ঝি ঝি শোনায় বলে এরা পরস্পরকে মিসেস সেন ও মিসেস মৈত্র বলে সম্বোধন করে। কেউ কারুর নাম জানে না, কিংবা জানলেও তা উচ্চারণযোগ্য ঘনিষ্ঠতা হয়নি। এত রাতে টেলিফোন করবার মতন ঘনিষ্ঠতাও নয়।

—না, বিন্টু কিছু বলেনি। ও ঘুমোচ্ছে। আপনি কী খবর বললেন, আমি বুঝতে পারলাম না। অন্দরের ঘর ? তার মানে কী ?

—অন্ধ্রের ঝড়! অন্ধ্রের ঝড়! কাল ওদের 'এসে' আসবে···বাংলা পরীক্ষায়।

—অ্যাঁ ? বাংলা পরীক্ষার এসে—

—হ্যাঁ।

—আপনি কী করে জানলেন ? মানে, জানা গেল কী করে ? কে বললো ?

—আমাকে সন্ধেবেলাতেই ফোন করে বলেছিলেন মিসেস ঘোষাল। তখনই ভাবলুম আপনাকে জানিয়ে দিই। কিন্তু টেলিফোনে· ·। মিসেস ঘোষালকে বলেছেন অণিমাদির···আপনি অণিমাদিকে বোধহয় চেনেন না।

—হ্যাঁ চিনি। সিদ্ধার্থর মা তো?

—হ্যাঁ। সেই অণিমাদির বাড়িতে গগনানন্দ মহারাজ এসেছেন, জানেন তো? তিনি শুধু বড় সাধক নন, খুব জ্ঞানী, আগে রামযশপুর কলেজের প্রফেসার ছিলেন, আমি দেখা করতে গিয়েছিলুম একদিন···তিনি আজ অণিমাদিকে বলেছেন, খোকা কি অন্ধ্রের ঝড় বিষয়ে কিছু জানে? একটু শিখিয়ে পড়িয়ে দাও, কাল পরীক্ষায় কাজে লাগবে।

—উনি বললেন, এই কথা?

—হ্যাঁ। কালকেই যে বাংলা পরীক্ষা তাও উনি জানতেন না, এমনিই বললেন···আর অণিমাদি কি ভালো দেখুন, কথাটা শুনে উনি শুধু নিজের ছেলের জন্যই তো···তা নয়, উনি কিন্তু সবাইকে বলে দিচ্ছেন, এখনো তৈরি করে নেবার সময় আছে···

পাঁচ মিনিট বাদে ফোন রেখে সুমিত্রা যখন খাবার টেবিলে ফিরে এলো, তখন তার মুখ দেখে মনে হয়, সে সদ্য ভূত দেখেছে।

শৈবালের অনেকখানি খাওয়া হয়ে গেছে, সে মুখ তুলতেই সুমিত্রা জিজ্ঞেস করলো, অন্ধ্রের ঝড়। তার মানে কী? অন্ধ্রতে খুব ঝড় হয়েছে বুঝি?

মেয়েদের পক্ষেই যখন তখন এরকম উদ্ভট কথা বলা সম্ভব, তা সুমিত্রা জানে, তাই সে অবাক হয় না।

সে বললো, নিউজে তো কিছু শুনিনি।

—নিউজে তো আজে বাজে কথাই বলে বেশী, আসল দরকারি খবর··· কী করে কখন জানা যায়।

—কিন্তু অন্ধ্রে ঝড় হচ্ছে কিনা···হাউ ইজ ইট সো ইম্পর্টান্ট টু য়্যু?

—বিল্টুদের কাল বাংলা পরীক্ষায় রচনা আসবে···অন্ধ্রের ঝড়।

—আজকাল মিশনারি ইস্কুলেও কোশ্চেন লীক হয়ে যাচ্ছে বুঝি?

—একজন বলেছে, ডেফিনিটলি আসবে।

—সেই একজনটা কে ? কোনো জ্যোতিষী ?

—তুমি নাম শোনো নি, কিন্তু গগনানন্দ মহারাজ খুব বিখ্যাত, ওঁর মুখের প্রত্যেকটা কথা ফলে যায়।

সাধু ? মাই গড ! তোমরা আজকাল ছেলের পরীক্ষার কোয়েশ্চেন জানবার জন্য সাধুদের কাছে যাচ্ছো ? তাও ক্লাস এইটের পরীক্ষা !

—আমি যাই নি···মিসেস সেন খবরটা দিলেন···উনি কত ভালো, কষ্ট করে এত রাতে···

—গুরুদেরও এতখানি ডিজেনারেশন···

—শোনো, কোথা থেকে এখন অভ্রের ঝড় বিষয়ে জানা যায় বলো তো ?

—ফরগেট ইট অ্যাজ আ ব্যাড জোক্ !

—ইট্‌স ভেরি ইজি ফর ইউ টু ফরগেট এভরিথিং।

সুরজিতের ইচ্ছে হলো এক্ষুণি দু' হাত দিয়ে কান চেপে ধরতে। এরপরেই সুমিত্রা একে একে বলে যাবে অনেকগুলো অভিযোগ, সুরজিৎ বাড়ির কোনো খবর রাখে না। ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার সব দায়িত্ব তো সুমিত্রাই এতদিন···এত চেষ্টা করেও একজন অঙ্কের টিচার পাওয়া যাচ্ছে না, তুমি তো এক কান দিয়ে শুনে এক কান দিয়ে বার করে দাও···

প্রাণপণে অন্যমনস্ক থাকবার চেষ্টা করে সুরজিৎ শুধু সুমিত্রার বাক্যস্রোতের শেষ অংশটা শুনলো।

—যদি সত্যিই কাল আসে এই রচনাটা, বিল্টু এক লাইনও লিখতে পারবে ? অভ্রের ঝড় বিষয়ে আমি নিজেই কিছু জানি না। বিল্টুদের বাংলার টিচারটা মহা পাজি···ক্লাসে কিছু পড়াবার নাম নেই, পরীক্ষার সময় শক্ত শক্ত প্রশ্ন দেবে···

মিংকা খাবার সময় মিল্‌স অ্যাণ্ড বুন্‌স উপন্যাস পড়ে, নইলে খাওয়াতে তার মনই লাগে না। বাবা-মায়ের কথা কাটাকাটিতে সে কখনো অংশ গ্রহণ করে না, কিন্তু আজ বিল্টুর পরীক্ষার প্রসঙ্গ উঠেছে বলেই সে কান খাড়া করে শুনছে।

এবার মিংকা প্রশ্ন করলো, মা, হোয়াট ইজ সো স্পেশাল অ্যাবাউট অন্ধ্রের ঝড় ? ঝড় তো সব জায়গাতেই হয়।
সুমিত্রা ঝংকার দিয়ে বললো, আমি তা কী করে জানবো ! রেডিও স্টেশানে ফোন করলে ওরা বলতে পারবে না ? কিংবা আলিপুরে ওয়েদার অফিসে···
সুরজিৎ বললো, কয়েক বছর আগে অন্ধ্রের পোস্টাল রিজিয়ানে একটা বিরাট ডিজাস্টার হয়েছিল···দারুণ ঝড়ে সমুদ্র ফুলে ফেঁপে উঠেছিল, তিন চারতলা উঁচু ঢেউ আছড়ে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল কয়েকটা গ্রাম, বোধহয় কয়েক হাজার মানুষ···
আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো সুমিত্রার মুখ। পথহারা যেন পেয়েছে আলোর সন্ধান। কিংবা ধোপার হিসেবের খাতার মধ্যে যেন পাওয়া গেছে একটা একশো টাকার নোট।
—ঠিক বলেছো ! এটাই তো রচনার সাবজেক্ট ! সেই জন্যই গগনানন্দ অন্ধ্রের ঝড়ের কথা বলেছেন। এখন কী হবে !
সুরজিতের খাওয়া হয়ে গেছে, সে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।
সুমিত্রা অনুনয় করে বললো, এই শোনো, লক্ষ্মীটি, তুমি একটা লিখে দাও, বেশ পয়েন্ট ধরে ধরে···
সুরজিৎ প্রকাণ্ড বিস্ময়ের সঙ্গে বললো, আমি লিখবো বাংলার রচনা ? আর ইউ ক্রেজি ! জীবনে এক পাতা বাংলায় চিঠি লিখিনি কখনো··· বেঙ্গলি আমার সেকেণ্ড সাবজেক্ট ছিল, কোনোরকমে তেত্রিশ পেয়েছিলুম !
—তোমাদের বেলায় খুব সুবিধে ছিল। এখন বাঙালীদের কিছুতেই বেঙ্গলি সেকেণ্ড ল্যাঙ্গোয়েজ নিতে দেয় না···মহা ঝামেলা। বিল্টু শুধু বাংলাতেই উইক।
মিংকা বললো, হোয়াট অ্যাবাউট বিল্টুর বাংলা টিচার, মা ?
—তাকে এত রাত্রে কোথায় পাবো ? তা ছাড়া ছেলেটি বড্ড কামাই করে, কিচ্ছু পড়ায় না, ওকে আর রাখবো না ভাবছি।

স্বরজিৎ বললো, সে ছোকরা কবিতা লেখে না ? প্রথম দিন চেহারা দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল···ঐ ধরনের ছেলেরা জেনারেলি আন-রিলায়েবল হয়।

—ছেলেটি এ পাড়াতেই কোথায় থাকে না ? বিন্টুর খাতায় বোধহয় ঠিকানা লেখা আছে। তুমি প্লীজ একটু দেখবে ? ওকে ডেকে এনে যদি রচনাটা লিখিয়ে ফেলা যায়, আমি ঠিক বিল্টুকে মুখস্ত করিয়ে দেবো।

স্বরজিৎ ভাবলো, তার মতন নরম স্বামীদেরই বউরা এরকম উৎকট অনুরোধ করার সাহস পায়। রাত সাড়ে দশটার সময় সে যাবে ছেলের প্রাইভেট টিউটরের বাড়ি খুঁজতে ? সে কি শ্যামবাজারে ছিট কাপড় বিক্রি করে না যাদবপুরের আলুওয়ালা ? সব কিছুরই একটা সীমা থাকা উচিত। মুস্কিল হচ্ছে এই সুমিত্রার মতন মেয়েরা হুইস্কি বা সিগারেট খেতে শিখেছে, পার্টিতে গিয়ে দিব্যি ইংরেজি বলে, ডিস্কো বাজনার সঙ্গে নাচতেও জানে অন্য পুরুষদের সঙ্গে, কিন্তু জ্যোতিষী কিংবা গুরুঠাকুর ছাড়তে পারে নি এখনো। কে না কে বলেছে অন্ধ্রের ঝড় !

সামান্য কারণে সুমিত্রা যখন দারুণ উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে, তখন তার মুখখানি দারুণ সুন্দর দেখায়। মুখের চামড়া যেন টস্‌টস করে। এই সময় স্বরজিৎ তার স্ত্রীর মনে কোনো আঘাত দিতে চায় না।

রূঢ় কিছু বলার বদলে সে অমায়িক ভাবে হেসে বললো, আমি গেলেই কি তোমার বাংলার টিচারকে এখন বাড়িতে পাবো ভাবছো ! ঐ সব কবি-টবিরা রাত দেড়-দুটোর আগে বাড়িই ফেরে না। তাও কী অবস্থায় ফিরবে···কাল সকালে চেষ্টা করো।

—কাল সকালে মাত্র দু' ঘণ্টা সময়। আচ্ছা, তুমি অন্তত পয়েন্টসগুলো বলে দিতে পারবে ? কোন্ বছরে ঐ ঝড় হয়েছিল ?

—তা তো ঠিক মনে নেই।

—কত লোক মরেছিল ?

—এগ্‌জ্যাক্টলি তা-ও বলতে পারবো না। যত দূর মনে আছে, কয়েক হাজার।

—এরকম শক্ত 'এসে' দেবার কোনো মানে হয়, তুমি বলো?

—আসবেই যে তো তুমি কী করে জানছো? হয়তো সব ব্যাপারটাই···

—আমি জানি, আসবেই! নইলে উনি এমনি বলবেন? ইস্, মিসেস সেন যদি সন্ধেবেলাতেও খবরটা দিতে পারতেন···

মিল্স অ্যাণ্ড বুনস্ থেকে আবার মুখ তুলে মিংকা বললো, মাদার টেরিজাকে ফোন করো মা? ডেড অর ডায়িংদের ব্যাপারে শী নোজ্ এভরিথিং।

সুরজিৎ ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকালো মেয়ের দিকে। তারপর একটু কড়া গলায় বললো, হাতের এঁটো শুকিয়ে গেছে, যা ধুয়ে আয়?

মেয়ের প্রস্তাব সামান্য সংশোধন করে সুমিত্রা বললো, রামকৃষ্ণ মিশন নিশ্চয়ই জানবে। কিংবা খবরের কাগজ! স্টেটসম্যানে তোমার কে যেন চেনা আছে না?

—তুমি খবরের কাগজে ফোন করো, তারপর কালই কাগজে ছাপা হয়ে যাবে যে বিল্টুদের স্কুলে কোয়েশ্চেন আউট হয়ে যায়। তারচে ছেড়ে দাও না, বাংলায় একটু কম নম্বর পেলে কী ক্ষতি হবে? ওর বাবাই বাংলা জানে না, ও কী করে বাংলায় দিগ্গজ হবে!

—আমি তোমার চেয়ে অনেক ভালো বাংলা জানি।

—তুমি বাংলা নভেল পড়ো, তা হলে তুমিই লিখে ফেলো রচনাটাটা—

—ফ্যাক্টস অ্যাণ্ড ফিগারস জানতে হবে তো! তোমার কাছ থেকে তো কোনো সাহায্য পাবার উপায় নেই।

সুরজিতের আবার কান চাপা দিতে ইচ্ছে হলো।

রাত পৌনে এগারোটা, তবু সুমিত্রা নিরুদ্যম হলো না। সে একটার পর একটা টেলিফোন করে যেতে লাগলো। আর যে-হেতু এখন সুরজিতের পক্ষে বিছানায় শুয়ে পড়া অপরাধ হবে, তাই সুরজিৎ বসবার ঘরে সোফায় এলিয়ে বসে পাইপ ধরালো।

যাকে নিয়ে এত ব্যাপার, সেই বিল্টু এখন গভীর ঘুমে মগ্ন। বিকেলবেলা দারুণ খেলাধুলো করে বলে বিল্টু একদম রাত জাগতে পারে না।

পরীক্ষার আগে মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার বলে সুমিত্রাও তাকে সাড়ে আটটার মধ্যে খাইয়ে দেয়। পরীক্ষা থাক আর নাই থাক, ঘুমের আগে কিছুক্ষণ কমিক্স পড়া চাই-ই বিল্টুর। কৈশোরের সুন্দর, মসৃণ, নির্ভেজাল ঘুম মাখা আছে তার মুখে

কার কার কাছ থেকে যেন বেশ কিছু তথ্য জোগাড় করে ফেললো সুমিত্রা। টপাটপ কাগজে লিখেও ফেললো সেগুলো।

তারপর এক গেলাস গরম দুধ নিয়ে সে পা বাড়ালো বিল্টুর ঘরের দিকে।

সুরজিৎ মৃদু আপত্তির সুরে বললো, তুমি এখন বিল্টুকে পড়াবে? এত রাত্তিরে?

সুমিত্রা এমন একটা ভ্রূভঙ্গি করলো, যার ওপর আর কোনো কথা চলে না।

তা ছাড়া, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে তার কিছু বলারও অধিকার নেই। কেননা, অন্যান্য অনেক আদর্শ স্বামীর মতন, সে কখনো নিজের ছেলে-মেয়েদের পড়াবার চেষ্টাও করে নি। ডায়সেশানে পড়া মেয়েকে সে বিয়ে করেছে তো এই জন্যই প্রায় বলতে গেলে।

সুমিত্রা খুব আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে বিল্টুকে জাগালো। প্রথমে সে জেদীর মতন দু' হাত দিয়ে মাকে ঠেলে দেখার চেষ্টা করছিল, তারপর এক সময় চোখ মেলে উদভ্রান্ত ভাবে জিজ্ঞেস করলো কী হয়েছে মা?

—দুধটা খেয়ে নে তো, লক্ষ্মী সোনা।

ঘুমের ঘোরেই দুধটা খেতে খেতে বিল্টু এক সময় পরিপূর্ণ সজাগ হলো।

—শোন্ বিল্টু, কাল বাংলা পরীক্ষায় যদি অন্ধ্রের ঝড় সম্পর্কে 'এসে' আসে, তুই কিছু লিখতে পারবি?

—অন্ধ্র কী মা?

—অন্ধ্র হচ্ছে ইণ্ডিয়ার একটা স্টেট।

—আঃ, বাংলায় বলো না। স্টেট বাংলায় কী?

—স্টেট হচ্ছে রাজ্য। আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল যেমন একটা স্টেট। সেই

রকম অন্ধ্র হলো সাউথে।

বিন্টু ভালো ছেলে, পড়াশুনোয় তার আগ্রহ আছে। সে মায়ের কথা মন দিয়ে শুনতে লাগলো। অবশ্য এক একবার তার চোখ বুজে আসছে, আর মা তাকে আদর করে বলছে, আর একটু শোন, এইটাই লাস্ট পয়েন্ট, তুমি যদি সেখানে উপস্থিত থাকতে, তা হলে তুমি কী করতে? স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন···দুর্গতদের সেবা।

প্রায় দেড় ঘন্টা চললো এরকম। সুরজিতেরও ধৈর্য কম নয়, সেও জেগে বসে আছে। বিন্টুর ঘর থেকে সুমিত্রা বেরিয়ে আসবার পর সে উঠে দাঁড়িয়ে সুমিত্রার পিঠে হাত রেখে গাঢ় গলায় বললো, সত্যি, ইউ আর গ্রেট!

সুমিত্রা বললো, তোমার তো কোনো হুঁস নেই, আজকাল বাংলায় ফেল করলে পুরো ফেল!

পরদিন সকালে, শুধু স্নানের সময়টুকু বাদ দিয়ে সব সময়, এমনকি খাবার সময়েও বিন্টুকে পাখি পড়াতে লাগলো। বিন্টু একবার একটু আপত্তি করেছিল, কেননা, আজ বাংলার সঙ্গে জিওগ্রাফি পরীক্ষা আছে, কিন্তু মা জিওগ্রাফি পড়তে দিচ্ছে না। কিন্তু জিওগ্রাফির জন্য সুমিত্রার চিন্তা নেই, ওতে বিন্টু বারবার এইট্টি পারসেন্ট নম্বর পায়।

মধু দিয়ে টোস্ট আর এগ্ পোচ বিন্টুকে খাওয়াতে খাওয়াতে একেবারে শেষবারের মতন সুমিত্রা মনে করিয়ে দিলো, ভুলে যাস না, ভলান্টিয়ার্স-এর বাংলা হলো স্বেচ্ছাসেবক। স-এ ব-ফলা আছে। আর দুর্গত··· আর লঙ্গরখানা মানে হলো এখানে ফ্রি খাবার দেওয়া হয়—।

মহাপুরুষদের দিব্যদৃষ্টি একেবারে মিথ্যে হয় না। গগনানন্দ সম্ভবত সামান্য একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলেন, তাই তাঁর দিব্যদৃষ্টি একটু অন্যদিকে সরে গিয়েছিল। বিন্টুদের রচনা এসেছে, পশ্চিমবঙ্গে বন্যা।

প্রশ্নপত্রটি পড়বার পর মায়ের ওপর খুব অভিমান হলো বিন্টুর। সমুদ্রের ঢেউ-এসে বন্যা হয় কি না তা সে জানে না। ঝড় থেকে হয়? অন্ধ্রে স্বেচ্ছাসেবক থাকে, পশ্চিমবাংলায় তাদের কী বলে? মা কেন এসব বলে

দেয়নি ?

একটু দূরে বসা অমিতাভর সঙ্গে চোখাখোখি হলো বিল্টুর। দুজনের চোখে একই রকম ভাষা।

দুই অভিমানী কিশোর মুখ গোঁজ করে বসে রইলো খাতার সামনে।



ছবি

নিজের বাবার কাছ থেকে প্রায় সারাটা বাল্য-কৈশোর খুব বকুনি খেয়েছে বলে মনীশ ঠিক করেছে, সে তার ছেলেকে কখনও বকবে না। তা ছাড়া, শিশুদের পদে পদে বকুনি দিলে কিংবা তাদের সব কৌতূহল চরিতার্থ না করলে শিশুদের মানসিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটে না, মহিলা ম্যাগাজিনগুলির এই ধরনের উপদেশও মনীশ খুব মানে। কিন্তু মহিলা ম্যাগাজিনের বিশেষজ্ঞরা মনীশের ছেলে বাপ্পাকে দেখেননি। সাড়ে ছ' বছর বয়েসে সে একটি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বিচ্ছু! কিছু দাড়ি কাঁচা এবং কিছু দাড়ি পাকা কেন তা জানবার জন্য বাপ্পা তার দাদুর দাড়ি টেনে ছেঁড়ার চেষ্টা করেছিল।

ছেলেকে প্রশ্রয় দিয়ে মনীশ মিটিমিটি হাসে, সব কিছু সামলাতে হয় সোমাকে। ট্রেন যাত্রা সোমার কাছে বিভীষিকার মতন। সাড়ে ছ'বছরের শরীরে একটি দৈত্যের মতন প্রাণশক্তি বাপ্পার, সে দু'মিনিট স্থির হয়ে বসতে পারে না। প্রথমে তাকে জানলার ধারের জায়গাটি দিতে হবে, একটু পরেই সে সব কটি জানলার ধারে বসতে চাইবে। ছুটে ছুটে সে অন্য জানলাগুলির কাছে যাবে, অন্য যাত্রীদের ঠেলে ঠেলে বসবে। অচেনা কোনোও যাত্রীর যদি এই ফুটফুটে বাচ্চাটিকে দেখে বাৎসল্য জাগে, বাপ্পাকে কাছে টেনে আদর করতে চায়, তাহলেই বুঝবে মজা। হাত কামড়ে দেবার পর্যন্ত রেকর্ড আছে বাপ্পার। আর সমবয়েসী বা

একটু বড় বয়েসী কোনো বাচ্চাকে যদি পেয়ে যায়, তা হলে তার প্রতি বাপ্পার ব্যবহার হবে ছিঁচকে চোরের প্রতি ডাকাত সর্দারের মতন।

সোমা সব সময় সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। বারবার উঠে সে বাপ্পাকে টেনে নিয়ে আসে। মায়ের শাসন একেবারেই গ্রাহ্য করে না ছেলে। মায়ের স্নেহময় হাতের জোরের চেয়ে তার দুর্বৃত্তপনার জোর অনেক বেশি। একটু পরেই আবার সে ছিটকে চলে যায়। মনাশ উদার প্রশ্রয়ের সুরে বলে, আহা থাক না, চোখে চোখে রাখলেই তো হলো।

সোমার তবু ভয় হয়, যদি দরজার কাছে গিয়ে বাইরে পড়ে যায়।

দীপ আর জয়া দু'জনেই বই পড়ছে। এমন একটা ছেলেকে নিয়ে সর্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত থাকতে হলে গল্প জমে না। দীপ এমনিতেই বাচ্চাদের সঙ্গে ভাব জমাতে পারে না, বাপ্পার সঙ্গে ভাব করার তো কোনোও প্রশ্নই ওঠে না। বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা ছবিতে। এক একসময় দীপের ইচ্ছে করে বাপ্পার কান ধরে টেনে ঠাস ঠাস করে কয়েকটা চড় কষাতে। কিন্তু বন্ধুর ছেলেকে সে কোনোও শাস্তি দেবার অধিকারী নয়।

ট্রেন ছাড়ার পরই বৃষ্টি নেমেছিল। এত বৃষ্টির তোড় যে চতুর্দিক যেন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। দীপ তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বার করে ঝাপসা গাছ পালার ছবি তুললো কয়েকটা। যদি ঠিক ঠাক ওঠে, তাহলে এই সব ছবিতে ওয়াশ-এরএফেক্ট আসে। দীপ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ছবি পাঠায়।

বাপ্পা সরু চোখে ক্যামেরাটা দেখলো কয়েক মুহূর্ত, তারপর বললো, আমায় দাও, আমি ছবি তুলবো!

এই বিচ্ছুর হাতে দীপের শখের ক্যামেরা? অসম্ভব। দীপ গম্ভীর ভাবে বললো, বড়দের জিনিস, হাত দেয় না।

কিন্তু এই কথাটা বাপ্পা এতবার শুনেছে যে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। সে তবু বলতে লাগলো, দাও, আমি ছবি তুলবো, দাও!

জয়া জানে ক্যামেরা সম্পর্কে দীপের দুর্বলতা। নিজের ছেলেকে হাত দিতে দেয় না। সামলাবার জন্য সে বললো, তুমি বাপ্পার একটা ছবি

তুলে দাও! বাপ্পা, তুমি মায়ের পাশে বসো।

টিপিক্যাল গ্রুপ ছবি তুলতে একেবারে পছন্দ করে না দীপা। আজকাল হট শট ক্যামেরা বেরিয়েছে কতরকম, অ্যাপারচার, ফোকাসের ঝামেলা নেই, শাটার টিপে এই সব ছবি যে কেউ তুলতে পারে। তাছাড়া, এ ছেলে তো শান্ত হয়ে বসবে না। ঠিক মতন ফ্রেমিং না হলে সে ছবির কোনোও মানে হয়?

তবুও মনীশ-সোমা-বাপ্পার দু'তিনটি স্ন্যাপ নিল দীপ। তাতে বাপ্পা একটুও ভুললো না, আবার বলতে লাগলো, ক্যামেরা আমায় দাও, আমি নিজে তুলবো···। দীপের গায়ের ওপর উঠে এসে কেড়ে নেবার চেষ্টা করলো ক্যামেরা।

দীপ তাড়াতাড়ি ক্যামেরাটা ভরে ফেললো ব্যাগের মধ্যে। ব্যাগটা তুলে দিলো ওপরে।

এরপর বাপ্পা ছুটে ছুটে দূরে চলে যায়, সোমা তাকে ধরে আনে, বাপ্পা প্রত্যেকবার বলে, ও কেন আমায় ক্যামেরা দিলো না? ঐ পাজিটা? একবার বাপ্পাকে দেখাই গেল না। সোমা কান্না মিশ্রিত জ্বলন্ত চোখে স্বামীর দিকে তাকাতেই মনীশ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, দেখি? দেখছি! দেখছি! তোমার ছেলের প্রচুর বুদ্ধি, সে বাইরে ঝাঁপ দেবে না!

বাপ্পা চলে গেছে পাশের কামরায়। সেখান থেকে সে কিছুতেই আসবে না, জোর করে টেনে আনা হলো। এসেই সে চিৎকার করে কেঁদে উঠে বললো, ঐ লোকটা কেন আমায় ক্যামেরা দেবে না? আমি তোমাদের সঙ্গে থাকবো না!

যতই অন্য কিছু বলে ভোলাবার চেষ্টা করা হোক, ভবী ভোলবার নয়। ক্যামেরার কথা তার মাথায় গেঁথে গেছে। ফেরিওয়ালার কাছ থেকে তাকে চকোলেট কিনে দেওয়া হলো তাও সে ফেলে দিলো জানলা দিয়ে।

মনীশ এবার দীপকে বললো, ক্যামেরাটা একবার আমাকে দে তো! বন্ধু চাইলে আপত্তি করা যায় না।

মনীশ ছেলেকে কোলে বসিয়ে নিজে ক্যামেরাটা ধরে রেখে বললো, এই তো, এবার ছবি তোলো! এইখানে টিপতে হবে।

বাপ্পা আগে ভিউ ফাইণ্ডারে চোখ লাগালো। কয়েক মুহূর্ত শুধু শান্ত হয়ে দেখলো লেনসের মধ্যে দিয়ে দেখা দৃশ্য। তারপরই জেগে উঠলো স্বাধীনতা স্পৃহা। এক ঝটকায় নেমে গেল বাবার কোল থেকে। ক্যামেরাটাও ছিনিয়ে নিয়েছে। হি হি হি করে প্রাণ খোলা আনন্দে হাসতে হাসতে দৌড় লাগালো।

শিশুদের হাসি কতো সুন্দর হয়, কিন্তু দীপের মনে হলো ঐ শব্দ যেন বিছুটির চাবুক।

শুধু হাত থেকে পড়ে গেলে ততো ক্ষতি ছিল না, কিন্তু ছুটন্ত অবস্থায় পড়লো বলেই বেশ জোরে শব্দ হলো। ততক্ষণে মনীশ আর দীপ দু-জনেই দৌড়ে এসেছে, দীপই আগে তুলে নিল।

বাপ্পা এতক্ষণে একটু ভয় পেয়েছে। মিনমিনে গলায় বললো। ভাঙেনি, ভাঙেনি।

মনীশও বললো, দেখি, দেখি, ভাঙেনি, তাই না? যাক বাবা, কিছু ক্ষতি হয়নি!

ভাঙেনি, ফাটেনি, লেনসে-এরও কোনোও ক্ষতি হয়নি, কিন্তু শাটার লক্ড হয়ে গেছে। টেপাটিপি করলেও ভেতরটা অনড়।

মনীশ বললো, ওটা ঠিক করা যাবে। আমার চেনা খুব ভালো দোকান আছে। তুই কিছু চিন্তা করিস না, দীপ। আমি সারিয়ে দেবো!

দীপ শুকনো ভাবে হাসলো। তার ভেতরটা রাগে জ্বলে যাচ্ছে। ইচ্ছে করছে বাপ্পাকে টেনে দুটো লাথি কষাতে। কিন্তু জয়া তার চোখের দিকে চেয়ে আছে, জয়া মিনতি করছে তাকে ভদ্রতা রক্ষা করতে।

মনীশ ইঙ্গিত করলো যে সারাবার খরচ সে দিয়ে দেবে। কিন্তু খরচের ব্যাপারটা যে কিছুই না, তা মনীশ বুঝবে না। ঠিক এই রকম আর একটা নতুন ক্যামেরা কিনলেও দীপের দুঃখ ঘুচবে না। এক একটা ক্যামেরায় এমন হাত সেট করে যায় যে সেই ক্যামেরা ও তার মালিক

যেন পরস্পরের ভাষা বোঝে। সেই ক্যামেরা অন্যের হাতে গেলে অভিমান করে। এখন সেই রকমই কোনোও প্রবল অভিমানে ক্যামেরাটা শাটার বন্ধ করে আছে।

সোমা বাপ্পাকে জোর ধমক দিয়ে বললো, বারণ করেছিলাম, তবু ক্যামেরাটা নিয়ে···কাকু এবার রাগ করবেন।

মনীশ বললো, আচ্ছা, ওকে বকছো কেন, ও কি কিছু বোঝে।

মনটা বিস্বাদ হয়ে গেছে দীপের, তবু কোনক্রমে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললো ঠিক আছে, এ নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না!

ঘাটশিলায় পৌঁছে গেল ট্রেন। আজকাল স্টেশনে অটো রিক্সা, দু'একটা ট্যাক্সিও পাওয়া যায়। কিন্তু ওরা দুটো টাঙ্গা ভাড়া করলো। স্মৃতির গলিপথ দিয়ে ফিরে যাওয়া। বহুবছর আগে, প্রায় বাচ্চা বয়েসে মনীশ আর দীপ ওদের বাবা-মায়েদের সঙ্গে যখন প্রথম ঘটশিলায় এসেছিল, তখন টাঙ্গায় চেপেছিল জীবনে প্রথমবার। বাপ্পারও সেই রকম একটা স্মৃতি থাকবে। এখন দীপদের একটা বাড়ি আছে এখানে। মনীশ বহুকাল এদিকে আসেনি।

দীপ আর জয়া মনীশদের নেমন্তন্ন করে এনেছে। সুতরাং ওদের ছেলে যতই দুষ্টুমি করুক, বাগানের গাছ নষ্ট করুক, রান্নাঘরে প্লেট ভাঙুক, তবু খাতির যত্ন করতেই হবে। দীপ বাজারে গিয়ে একগাদা মাছ আর আনাজ কিনে আনে, জয়া তিনখানা রান্নার বই এনেছে। সব রকম এক্সপেরিমেন্ট চালাচ্ছে এখানে। সোমার ইচ্ছে থাকলেও জয়াকে রান্নায় সাহায্য করতে পারে না, ছেলেকে সামলাতেই সে সর্বক্ষণ ব্যস্ত। বাগান পেরিয়ে বাপ্পা পেছনের মাঠে চলে যায়, সোমাকে ছুটতে হয় পেছন পেছন।

মনীশ বারান্দায় বসে পা নাচায়। সে বলেই দিয়েছে, সে শুধু আলস্য করতে এসেছে এখানে, কোনোও রকম কাজকর্মের মধ্যে নেই। বাপ্পার দুষ্টুমি ও সোমার নাজেহাল হওয়া সে উপভোগ করে। ছেলের বয়েসে সে নিজেও কম দস্যি ছিল না, উঃ তখন বাবার হাতে কী মার খেয়েছে।

কলকাতার ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকতে হয়, এখানে এত খোলামেলা পেয়েছে, ছেলেটা যা খুশি করুক।
দীপের মনটা সব সময় খচখচ করে ক্যামেরাটার জন্য। জার্মানি থেকে পাঁচ বছর আগে কিনেছিল। কোনোদিন একটুও গোলমাল করেনি। কিন্তু ক্যামেরা কি আছাড় মেরে ফেলার জিনিস ?
এখানে এত আলো যে সব দরজা-জানলা বন্ধ করলেও ঘরটা পুরো অন্ধকার হয় না। তাছাড়া ঘুলঘুলি আছে। দীপ একবার ক্যামেরাটা খুলে ফেললো। ভেতরে আদ্দেকটা ফিল্ম এক্সপোজড হয়ে আছে, সব ফগি হয়ে যাবে। তা যাক, তবু ক্যামেরাটার কী গণ্ডগোল, তা না জেনে দীপের স্বস্তি হচ্ছে না। এই সব ক্যামেরা একবার সারাতে দিলে আর কখনও আগের মতন হয় না। একেবারেই বারোটা বেজে গেল কিনা, তাইই বা কে জানে।
দীপ ক্যামেরাটাকে আদর করে, ফিসফিস করে কথা বলে।
একদিন পর ক্যামেরাটার মতি একটু বদলালো। শাটার রিলিজ হয়ে গেল বটে, কিন্তু ফিল্ম সরে না। অটোমেটিক ওয়াণ্ডিং হাত দিয়ে ঘোরানো ফোরানোর ব্যাপার নেই, কিন্তু শাটার পড়ছে, ফিল্ম সরছে না। এ আবার কী নতুন উপসর্গ।
দীপ বারবার শাটার টেপে, তব্ আর কোনোও পরিবর্তন ঘটলো না।
সারা বছর এ বাড়ি প্রায় খালিই পড়ে থাকে। ন'মাসে ছ'মাসে আসে দীপ আর জয়া। ওদের ছেলে দার্জিলিং-এ পড়ছে, ছুটির সময় সে কলকাতায় আসে বটে কিন্তু তখন তাকে ঘাটশিলায় আনা বাবা-মায়ের অসাধ্য। কলকাতায় তার কত বন্ধু।
এ বাড়ির কুয়োর জল খুব মিষ্টি, কাছাকাছি অঞ্চলে দীপদের কুয়োটি প্রসিদ্ধ। পাশেই রয়েছে সাঁওতালদের একটি বসতি, তারা অনেকেই এ বাড়ির কুয়ো থেকে জল নিতে আসে। দীপ তার কেয়ারটেকারকে বলে রেখেছে, জল নিতে এলে কারুকে বারণ করবে না। এমনকি পাড়ার বাচ্চারা এসে বাগানের ফল-পাকুড় খেলেও আপত্তি নেই, আর কে-ই

বা খাবে ?

বাইরের অনেক লোকজন আসে যায়, মনীশ বারান্দায় বসে তাদের সঙ্গে ডেকে ডেকে কথা বলে। লোকজনের সঙ্গে ভাব জমাতে সে ভালো-বাসে।

দুপুরবেলা বাপ্পাকে জোর-জার করে ঘুম পাড়ানো হয়। তখন চারজনে আড্ডা জমে। একমাত্র ঘুমেই বাচ্চারা জব্দ। একটি মাত্র সাড়ে ছ'বছরের বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়লে সারা বাড়ি একেবারে শান্ত হয়ে যায়। সোমার মুখে স্বাভাবিক ভাব ফিরে আসে।

বিকেল হয়ে এসেছে। রোদ্দুরের রং এখন কিছুটা হলুদ মেশানো। বাগা-নের দিকের বড় বারান্দাটায় বসে ওরা চা খাচ্ছে। দীপ শুধু নেমে গিয়ে টেপাটিপি করছে ক্যামেরাটা। ফিলিমটা ঘুরছে না কেন ? অথচ মনে হয় যেন যে কোনোও মুহূর্তে ঠিক হয়ে যাবে। যদিও ভেতরের পুরো রিলটাই আলো লেগে খারাপ হয়ে যাবার কথা, ঘুরুক, ঘুরুক অন্তত। ভেতরে একটা শব্দও হচ্ছে, কিন্তু নম্বর পাল্টাচ্ছে না।

এক খুনখুনে বুড়ি এ বাড়ির কুয়ো থেকে সারা দিনে তিন চার কলসি জল নিয়ে যায়। সেই বুড়িটি ভরা কলসি কাঁখে নিয়ে দাঁড়ালো দীপের পাশে। এক সময় সে বলে উঠলো, ও বাবা, তুমি ঐ কুকুরটার ছবি তুললে ?

বাগানের এক কোণে একটা কুকুর শুয়ে আছে। দীপ লক্ষ্য করে নি। সে কোনো উত্তর দিলো না।

বুড়িটা আবার বললো, তোমার ওতে কুকুরের ছবি ওঠে, আমার উঠবে না ?

দীপ এবারও কোনো উত্তর দিলো না।

বুড়ি এবার আরও কাছে এসে এক মহাসাগর ভরা মিনতির স্বরে বললো, ও বাবা, আমার একখান ছবি তুলে দেবে ? একখান ছবি ? কেউ কোন-দিন তোলেনি !

গলার স্বরের সেই আকুলতায় চমকে উঠলো দীপ।

অসহায় ভাবে সে বারান্দার অন্যদের দিকে তাকালো।

এখন বুড়িকে কী বলবে দীপ। ভদ্রলোক হওয়ার অনেক ঝামেলা আছে। ক্যামেরাটা খারাপ বললে কেউ বিশ্বাস করবে ? কলকাতার বাবুরা এসে বাগানের ছবি তোলে, এমনকি একটা কুকুরেরও ছবি তোলে, অথচ পাশের পল্লীর এক বুড়ির ছবি তোলে না। এর মধ্যে বাঙালি-বিহারীর প্রশ্নও এসে যেতে পারে। বুড়ি খুব সম্ভবত সাঁওতাল, তা হলে আসবে ঝাড়খণ্ডি সমস্যা। আদিবাসীদের উপেক্ষা করছে বহিরাগত উটকোবাবুরা।

বুড়ি আবার লজ্জা লজ্জা ভাব করে বললো, আমি কবে মরে যাবো, আমার ছেলেরা দেখবে, মনে রাখবে।

দীপ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপর বললো, ঠিক আছে, এই দিক-টায় এসে দাঁড়াও, ছায়া থেকে সরে এসো।

বুড়ি একটা আতা গাছের পাশে এসে বললো, এইখানটায় ?

ওখানে দাড়ালে মুখের এক পাশে স্যাডো পড়বে, তাতে কী আসে যায়। ফিল্ম নষ্ট, ক্যামেরা নষ্ট, সবই তো অভিনয়।

মনীশ, জয়ারা মজা পেয়ে গেছে! মনীশ বললো, ও বুড়িমা, হাসো, হাসো, গম্ভীর হয়ে আছো কেন ?

সোমা বললো, কলসিটা নামিয়ে রাখো। শরীরের এক দিকটা বেঁকে গেছে যে!

দীপ শাটার টিপে বললো, হয়ে গেছে।

বুড়ি কলসিটা মাটিতে নামিয়ে আবদারের সুরে বললো, আর একখানা? এইভাবে ?

জয়া বলে উঠল, একটু পাউডার মাখিয়ে দেবো নাকি ?

খচখচ করে তিন চারবার শাটার টিপলো দীপ। ফিলম এখনও সরছে না। সব ব্যাপারটাই মিথ্যে।

বুড়ির মুখে অদ্ভুত এক আনন্দ, লজ্জা আর সার্থকতার হাসি ফুটে আছে। কলসিটা আবার তুলে নিয়ে বললো, আবার যখন আসবে, তখন দিও। জয়ার দিকে তাকিয়ে বললো, ওমা, বাবাকে একটু মনে করিয়ে দিও! গেট পেরিয়ে চলে গেল বুড়ি। ছবি তোলা হয়েছে, এটাই বড় কথা, কবে

তা পাবে, তার জন্য কোনোও ব্যস্ততা নেই।

এমনিতেই আসা হয় না, তাছাড়া আগামী সপ্তাহে দীপকে অফিসের কাজের ট্রেনিং নিতে বোম্বে যেতে হবে। থাকতে হবে অন্তত সাত-আট মাস। খানিকটা অপরাধ বোধে ভুগতে লাগলো দীপ, অথচ যে অপ-রাধের জন্য সে দায়ী নয়। ক্যামেরাটা ভালো থাকলে কি সে বুড়ির অনু-রোধে কয়েকখানা ছবি তুলে দিতো না? এ বাড়ির মালির কাছে পোস্টে পাঠিয়ে দিতো।

পরদিনই কলকাতায় ফেরা।

মনীশের সাহায্য নেবার কোনোও দরকার হলো না। দীপের নিজেরই নির্দিষ্ট একটা দোকান আছে। মালিকের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক। সেই মালিক ক্যামেরাটা হাতে নিয়েই বললো, নিশ্চয়ই কেউ মাটিতে ফেলে দিয়েছিল?

ফিল্মের রোলটা ডেভেলপ করতে গিয়ে দেখা গেল, একটা মিরাকল ঘটে গেছে। প্রথম দিকের সবকটা ছবি নষ্ট। বৃষ্টির ছবি, ট্রেনের কাম-রার ছবি কিছুই নেই। কিন্তু শেষ দিন বাগানে দীপ এমনি এমনি যে সব শাটার টিপেছিল, সেই সব ছবিই উঠেছে। বাগানের গাছপালা, মাঠ, কুকুর, বাড়ির দেওয়াল, আর সবচেয়ে ভালো উঠেছে বুড়ির ছবি। তার-মধ্যে একটা স্ন্যাপ তো প্রতিযোগিতায় পাঠাবার মতন, মুখের একদিকে আলো। মাথার ওপর আতা গাছের কয়েকটা পাতা, এমন ভালো ছবি দীপ নিজেও খুব কম তুলেছে। আর দু'তিনটি ছবিতে বুড়ির মুখ সমস্ত ভাঁজ-টাঁজ ও সলজ্জ হাসি নিয়ে স্পষ্ট। বাঁধিয়ে রাখার মতন।

দোকানেব মালিক ক্যামেরাটায় নতুন একটা রিল ভরে দু'বার শাটার টিপলো। তারপর বললো, আপনার ক্যামেরাটা নিজে নিজেই ভালো হয়ে গেছে। আমায় কিছু করতে হলো না। অথচ লক হয়ে গিয়েছিল তো বটে। আশ্চর্য ব্যাপার!

দীপ অবাক হলো না। ক্যামেরাটার সঙ্গে তার যে একটা পারস্পরিক ভালবাসার সম্পর্ক আছে, তা তো অন্য কেউ জানে না।

ক্যামেরার ব্যাপারে দীপের খানিকটা কুসংস্কারও আছে। তার ধারণা হলো, একটা বাচ্চা ছেলের হাতে দেওয়া হয়েছিল বলেই ক্যামেরাটা অভিমান করেছিল। আবার বুড়ির ছবি তোলার সময় দীপের মান বাঁচাবার জন্যই ক্যামেরাটা আবার সচল হয়েছে।

ছবিগুলো ফুল সাইজ এনলার্জ করালো দীপ। আলো-ছায়ায় ছবিটার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে দীপ। নিজের সৃষ্টিতে নিজেই সে মুগ্ধ। এর আগে কোনোও বুড়ি-টুড়ির ছবি তোলেনি সে। এই ছবিটি নির্ঘাৎ প্রাইজ পাবে। বুড়ির মুখের এক্সপ্রেশান একেবারে নিখুঁত।

অফিসের কাজে বম্বে যাওয়াটা পিছিয়ে গেছে দিন-পনেরো, হাতে কিছু সময় পাওয়া গেছে। দীপ জয়াকে বললে, চলো, আর একবার ঘাটশিলা ঘুরে আসবে নাকি?

জয়া চমকে উঠে বললো, এর মধ্যেই আবার?

দীপ বললো, মনীশের ছেলেটার জন্য তো এক মুহূর্ত শান্তি পাওয়া যায় নি। এবার চলো, কয়েকটা দিন নিরিবিলি কাটিয়ে আসি।

বুড়িকে নিজের হাতে ছবিগুলো দেবার জন্যই যে দীপ যেতে চায়, তা নিজের স্ত্রীকে বলতেও লজ্জা পাচ্ছে। এটা আদিখ্যেতার মতন শোনাবে। পোস্টে ছবিগুলো পাঠাতে তো কোনোও অসুবিধে নেই।

জয়া যেতে রাজি নয়। বম্বে যাবার আগে তার অনেক গোছগাছ আছে। সময় যখন পাওয়া গেছে, সে বহরমপুরে বাপের বাড়িতেও একবার ঘুরে আসতে চায়।

দীপ বললো, তুমি যে বাগানে কিছু গাছ লাগাবে বলেছিলে, আমি তবে সেই ব্যবস্থাটা করে আসি। এরপর বেশি বর্ষা নেমে গেলে আর গাছ লাগানো যাবে না। আমরাও আর সাত-আট মাসের মধ্যে যেতে পারবো কি না সন্দেহ। ততদিনে গাছগুলো বড় হোক।

একাই চলে এলো দীপ।

কেয়ার টেকার বুধন বেশ বিব্রত হয়ে পড়লো। মাঠে ধান রোওয়া শুরু হয়েছে, সে এই সময়ে সেই কাজ করে কিছু উপরি রোজগার করে।

এই সময়টায় সব বেকাররাও মাঠের কাজ পায়।

সারাদিনে বুড়ির দেখা পাওয়া গেল না একবারও। বাগানের কাজ করতে করতে দীপ জিজ্ঞেস করলো, ঐ যে একটা খুব বুড়ি জল নিতে আসতো ··

বুধন বললো, সাঁওতালপাড়ার বুড়িটা তো? যার আপনি ছবি তুলেছিলেন? তার তো খুব অসুখ শুনেছি। খুব বৃষ্টিতে ভিজেছিল।

এরকম একটা সম্ভাবনা দীপের মনের মধ্যেও উঁকি মেরেছিল। যেমন খুনখুনে বুড়ি, বেশি দেরি হলে মরেও যেতে পারে। অত জল ভর্তি ভারি কলসি বইতো। ক'দিন ধরে বৃষ্টিও হলো খুব।

দীপ বললো, চলো তো, তাকে দেখে আসি!

ঠিক যে বুড়ির টানেই যাচ্ছে তা নয়। দীপের এখনও ধারণা, বুড়ির জন্যই তার ক্যামেরাটা ভালো হয়ে গেছে।

বাড়িটা কেনা হয়েছে বারো বছর, এরমধ্যে দীপ কক্ষণো সাঁওতালপাড়ায় কারুর বাড়িতে যায় নি। কারুর সঙ্গে তার ব্যক্তিগত পরিচয় নেই। জয়া তবু অনেককে চেনে।

উঠোনে গড়াগড়ি যাচ্ছে এক গাদা বাচ্চা, একজন ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছিল, তাকে ধপাস করে মারলো তার মা। ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকটা মুরগি, একটা কুকুর কী চিবোচ্ছে কে জানে। কোদাল আর একটা ঝুড়ি নিয়ে একটা ঝুপড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো এক মাঝবয়েসী পুরুষ।

বুধন তাকে জিজ্ঞেস করলো, এই তোর মা কোথায় রে?

সে লোকটি বুধনের বদলে দীপকে দেখলো আপাদমস্তক। মুখে একটা অপ্রসন্নভাব। বুধনকে সে জিজ্ঞেস করলো, কী চাই?

বুধন বললো, তোর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন আমাদের বাবু।

ভাব-ভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায় লোকটির কাজে যাবার জন্য খুব ব্যস্ততা। দিনের রোজগারটাই আসল কথা, বাজে কথা বলার সময় নেই!

সে সংক্ষেপে বললো, হাসপাতালে।

তারপর হনহন করে এগিয়ে গেল।

বুধন দীপকে বুঝিয়ে দিলো, বাঁচবে না বোধহয়, তাই হাসপাতালে দিয়ে

এসেছে।

একবার দীপ ভাবলো, হাসপাতালটা কোথায় জেনে নিয়ে সে সেখানেই যাবে বুড়িকে ছবিগুলো দিয়ে আসতে।

পরের মুহূর্তেই বুঝতে পারলো, তা হয় না। এটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। এক সাঁওতাল বুড়ির সঙ্গে দেখা করতে সে যাবে হাসপাতালে? অনেকে বিস্মিত ভুরু তুলে তাকেই দেখাবে। নাঃ, এটা তাকে মানায় না। সভ্যতার অঙ্গ হচ্ছে ভাবালুতা গোপন করা। হাসপাতালে বুড়িটা যদি তার চোখের সামনেই মারা যায়?

বুড়ির ছেলেকে ডেকে সে বললো, শোনো, তোমাব মায়ের ক'খানা ছবি তুলেছিলাম, তুমি রেখে দাও—

লোকটি ফিরে এসে ছবিগুলো হাতে নিল। দেখলো। তার শরীরে একটা অস্থিরতা। আকাশের দিকে তাকালো একবার। তার দেরি হয়ে যাচ্ছে। একটাও শব্দ উচ্চারণ করলো না সে। ঘরের দাওয়ার ভেতরের দিকের চালে ছবিগুলো গুঁজে রেখে সে দৌড় দিলো মাঠের দিকে।